লেবু

লেবু বাংলাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সমাদৃত ফল এবং দেশের সর্বত্রই এর চাষ হয়। বাংলাদেশে লেবুর মোট উৎপাদন প্রায় ৫৬ হাজার টন। লেবু বাংলাদেশের সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও মৌলভীবাজারে বেশি জন্মে। এ ছাড়া ঢাকার ধামরাই ও মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলায় প্রচুর পরিমাণে লেবু উৎপন্ন হয়। লেবু ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ ফল।

লেবু

লেবুর জাত

বারি লেবু-১ (এলাচী লেবু)

'বারি লেবু-১' জাতটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংগৃহীত ৩০টি জাতের মধ্য থেকে বাছাই করা হয়েছে। এ জাতের লেবু 'এলাচী মসলা' এর মত গন্ধযুক্ত বিধায় এর নাম এলাচী লেবু। এদেশে চাষাবাদের জন্য জাতটিকে ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়।

বারি লেবু-১

এলাচী লেবুর গাছ, পাতা ও ফল আকারে বড়। এলাচী লেবুর গাছে সময়মত ও পরিমাণমত সার ও পানি দিলে বছরে ২ বার ফল দিতে পারে। ফল জুলাই-আগস্ট (মধ্য-আষাঢ় থেকে মধ্য-ভাদ্র) মাসে খাওয়ার উপযুক্ত হয়। একটি গাছে ১০০-১৫০টি ফল ধরে। ফল ডিম্বাকার ও ফলের আকার ১১ × ৭.৫ সেমি। প্রতিটি ফলের ওজন ২৫০-২৭০ গ্রাম। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৫ টন।

ত্বক অমসৃণ ও পুরু, প্রায় ০.৭ সেমি। ফলে বীজের সংখ্যা ১০০-১১০টি। ফলে রস ২৫%, রসে ৫.৩% এসিড এবং ৩২ মিলি গ্রাম/১০০ গ্রাম ভিটামিন রয়েছে। এলাচী লেবু বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদ করা সম্ভব। তবে পাহাড়ি বৃষ্টিবহুল এলাকায় ফলন বেশি হয়।

বারি লেবু-২

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে জাত মূল্যায়নের মাধ্যমে 'বারি লেবু-২' জাতটি উদ্ভাবন করা হয় এবং ১৯৯৭ সালে অনুমোদন করা হয়। এটি প্রায় সারা বছর ফল উৎপাদনকারী উচ্চ ফলনশীল জাত।

পাতা ছোট আকৃতির ও সবুজ। নিয়মিত ফল ধরে। ফল প্রায় গোলাকৃতির হয়। টিএসএস ৭.৩০%। প্রতিটি ফলের ওজন ৭৫-৮৫ গ্রাম। ফলের আকার ৬ × ৫ সেমি, বহিরাবরণ মসৃণ, খোসার পুরুত্ব ০.৩০ সেমি এবং বীজের সংখ্যা ৪০-৫০টি। ফলের স্বাদ মাঝারী টক, রসের পরিমাণ খুব বেশি, ৩১-৩৪%। রসে ৭.২% এসিড এবং ৮৪ মিলি গ্রাম/১০০ গ্রাম ভিটামিন রয়েছে।

বীজের রং সাদাটে এবং লম্বা। প্রতি গাছে ১৮০-১৯০টি ফল ধরে। 'বারি লেবু-২' সমগ্র বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য উপযোগী। হেক্টরপ্রতি ফলন ১২ টন।

বারি লেবু-২

বারি লেবু-৩

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত লেবুর জার্মপ্লাজম মূল্যায়নের মাধ্যমে বাছাইকৃত জাত 'বারি লেবু-৩' নামে ১৯৯৭ সালে অনুমোদন করা হয়। পাতা ছোট আকৃতির ও সবুজ। নিয়মিত ফল ধরে।

ফল গোলাকার। ফলের গড় ওজন ৫০-৬০ গ্রাম। ফলের আকার মাঝারী (৫.৩ × ৫.২ সেমি), বহিরাবরণ খুবই মসৃণ, খোসার পুরুত্ব ০.৩০ সেমি এবং বীজের সংখ্যা ১৮-২২টি। ফলের স্বাদ হালকা টক, রসের পরিমাণ খুব বেশি (৩৭.৭%), রসে ৬.৮% এসিড ও ৬২ মিলি গ্রাম/১০০ গ্রাম ভিটামিন 'সি' রয়েছে। বীজের রং হালকা বাদামী থেকে সাদাটে।

বীজ লম্বাটে। সাত বছর বয়স্ক গাছে ২০০-২২০টি ফল ধরে। হেক্টরপ্রতি ফলন ১০ টন। এ জাতের লেবু বর্ষাকালে ভাল হয়। 'বারি লেবু-৩' জাতটি বাংলাদেশের সব এলাকায় চাষাবাদের জন্য উপযোগী।

বারি লেবু-৩

লেবুর উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি

লেবু হালকা দোআঁশ ও নিষ্কাশন সম্পন্ন মধ্যম অম্লীয় মাটিতে ভাল হয়।

মাদা তৈরি

চারা রোপণ করার ১৫-২০ দিন পূর্বে ২.৫ × ২.৫ বা ৩ × ৩ মিটার দূরত্বে ৬০ × ৬০ × ৬০ সেমি আকারের গর্ত করতে হবে। গর্তের উপরের মাটির সাথে ১০-১৫ কেজি জৈব সার, ২০০ গ্রাম টিএসপি ও ২০০ গ্রাম এমওপি সার ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে তাতে পানি দিতে হবে। এই হিসেবে প্রতি হেক্টর জমিতে ১১১১-১৬০০টি চারা দরকার হয়।

রোপণ পদ্ধতি

লেবুর চারা সারি করে বা বর্গাকার প্রণালীতে লাগালে বাগানে আন্তঃপরিচর্যা ও ফল সংগ্রহ সহজ হয়। পাহাড়ী ঢালু জমিতে আড়াআড়ি ভাবে লাইন বা সারি করে চারা লাগালে মাটি ক্ষয় কম হয়।

রোপণ সময়

মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত চারা লাগানোর উত্তম সময় তবে যদি সেচ সুবিধা থাকে তাহলে সারা বছরই চারা লাগানো যায়।

চারা/কলম রোপণ ও পরিচর্যা

মাদা তৈরি করার ১৫-২০ দিন পর চারা বা কলম লাগাতে হয়। চারা গর্তের ঠিক মাঝখানে খাড়াভাবে লাগাতে হবে এবং চারার চারদিকের মাটি হাত দিয়ে চেপে ভালভাবে বসিয়ে দিতে হয়। তারপর চারাটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে এবং চারার গোড়ায় ঝাঝড়ি দিয়ে পানি দিতে হবে। প্রয়োজনে প্রতিটি চারায় পৃথকভাবে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগ

চারা লাগানোর পর ভাল ফলন পেতে হলে নিয়মিতভাবে সময়মতো সার প্রয়োগ করতে হবে। নিম্নে বয়স অনুপাতে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ দেওয়া হল।

গাছের বয়স (বছর)	সারের নাম ও পরিমাণ			
	পচা গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
১-২	১৫	২০০	২০০	২০০
৩-৫	২০	৪০০	৩০০	৩০০
৬ এবং তদুর্ধ	২৫	৫০০	৪০০	৪০০

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

উল্লিখিত সার সমান তিন কিস্তিতে গাছের গোড়া হতে কিছু দূরে ছিটিয়ে কোদাল দ্বারা কুপিয়ে বা চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। পাহাড়ের ঢালে ডিবলিং পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। প্রথম কিস্তি বর্ষার প্রারম্ভে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ), দ্বিতীয় কিস্তি মধ্য-ভাদ্র থেকে মধ্য-কার্তিক (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) মাসে এবং তৃতীয় কিস্তি মাঘ-ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি) মাসে প্রয়োগ করতে হবে।

অঙ্গ ছাঁটাই

গাছের গোড়ার দিকে জল-শোষক শাখা বের হলেই কেটে ফেলতে হবে। এছাড়া, গাছের ভিতরের দিকে যে সব ডালাপালা সূর্যালোক পায় না সেসব দুর্বল ও রোগাক্রান্ত শাখা প্রশাখা নিয়মিত ছাঁটাই করে দিতে হবে। মধ্য-ভাদ্র থেকে মধ্য-কার্তিক (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) ছাঁটাই করার উপযুক্ত সময়। ছাঁটাই করার পর কর্তিত স্থানে বর্দোপেস্টের প্রলেপ দিতে হবে যাতে ছত্রাক আক্রমণ করতে না পারে।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন

খরা মৌসুমে ২-৩ বার সেচ প্রয়োগ করা দরকার। জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না বিধায় বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাতের সময় গাছের গোড়ায় যাতে পানি না জমে সেজন্য নালা করে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হয়।

অন্যান্য পরিচর্যা

লেবুর প্রজাপতি পোকা

এ পোকার কীড়া পাতা খেয়ে ফেলে। এজন্য ফলন ও গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

লেবুর প্রজাপতি পোকা

প্রতিকার

- ডিম ও কীড়াযুক্ত পাতা সংগ্রহ করে মাটির নিচে পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- সুমিথিয়ন ৫০ ইসি/লিবাসিড ৫ ইসি ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পরপর ২-৩ বার প্রয়োগ করতে হবে।

মিষ্টি লেবুর জাত

বারি মিষ্টি লেবু-১

মিষ্টি লেবু কমলা, মাল্টা ও বাতাবি লেবুর মতই একটি মিষ্টি পাল্পযুক্ত লেবু জাতীয় ফল। বিদেশে মিষ্টি লেবুর রস ফল প্রক্রিয়াজাত কারখানায় ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট 'বারি মিষ্টি লেবু-১' নামে ২০১৩ সালে মিষ্টি লেবুর একটি উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে।

এ জাতের পাকা ফল দেখতে আকর্ষণীয় সবুজ এবং খেতে সুস্বাদু। বেশ রসাল এবং ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ। জাতটি নিয়মিত ফলদানকারী এবং উচ্চ ফলনশীল। গাছ খাট, ছড়ানো ও অত্যধিক ঝোপালো।

মধ্য-ফাল্গুন থেকে মধ্য-চৈত্র পর্যন্ত গাছে ফুল আসে এবং আশ্বিন কার্তিক মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল গোলাকার, মাঝারী আকৃতির (১৪০-১৫০ গ্রাম)। ফলের দৈর্ঘ্য ৮ সেমি এবং প্রস্থ ৭ সেমি। ফলের খোসা মধ্যম পুরু ও শাঁসের সাথে সংযুক্ত। শাঁস হলুদাভ, রসালো, খেতে মিষ্টি ও সুস্বাদু (ব্রিক্সমান ৭.৫%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৫৫-৬০%। গাছপ্রতি ৩০০-৫৮০টি ফল ধরে। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩৫-৪০ টন। বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী ও পঞ্চগড়সহ দেশের সব অঞ্চলের জন্য উপযোগী।

বারি মিষ্টি লেবু-১

জলবায়ু ও মাটি

কম বৃষ্টিবহুল সুনির্দিষ্ট গ্রীষ্ম ও শীতকাল বিশিষ্ট শুষ্ক ও উষ্ণ জলবায়ু মিষ্টি লেবু চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত মিষ্টি লেবুর ফলের গুণাগুণকে প্রভাবিত করে। শুষ্ক আবহাওয়ায় ফলের স্বাদ উন্নত মানের হয়। আর্দ্র জলবায়ুতে রোগ ও ক্ষতিকর পোকার উপদ্রব বেশি হয়। মিষ্টি লেবু গাছ আলো পছন্দ করে এবং ছায়ায় গাছের বৃদ্ধি ও ফলের গুণগত মান কমে যায়। সব ধরনের মাটিতে জন্মিলেও সুনিষ্কাশিত, উর্বর, মধ্যম থেকে হাল্কা দোআঁশ মাটি মিষ্টি লেবু চাষের জন্য উত্তম। মধ্যম অম্ল থেকে সামান্য ক্ষারীয় মাটিতে মিষ্টি লেবু জন্মে তবে ৪.০-৯.৫ অম্লতায় (P^H) ভাল জন্মে। মিষ্টি লেবু দীর্ঘমেয়াদী জলাবদ্ধতা মোটেও সহ্য করতে পারে না।

বংশ বিস্তার

বীজ ও কলমের মাধ্যমে মিষ্টি লেবুর বংশ বিস্তার করা যায়। পরিপক্ক ফলের বীজ সংগ্রহ করে কয়েক দিনের মধ্যেই নার্সারীতে স্থাপন করে চারা উৎপাদন করা হয়। তবে বীজের চারায় মাতৃ গাছের গুণাগুণ বজায় থাকে না বিধায় কলমের মাধ্যমে চারা তৈরি করাই উত্তম। কলমের মাধ্যমে চারা উৎপাদন করলে সেটার মাতৃগুণাগুণও ঠিক থাকে ও দ্রুত ফল ধরে। এছাড়া রোগ প্রতিরোধী ও বলিষ্ঠ শিকড় সমৃদ্ধ আদিজোড়ের উপর কলম করার ফলে গাছের জীবন কাল ও ফলন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

জোড় কলম

গ্রাফটিং-এর জন্য প্রথমে রুটস্টক (আদিজোড়) উৎপাদন করতে হবে। রাটস্টক হিসেবে বাতাবিলেবু, রাফলেমন, কাটা জামির, রংপুর লাইম প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। অতঃপর কাঙ্ক্ষিত মাতৃগাছ হতে সায়ন (উপজোড়) সংগ্রহ করে রুটস্টকের উপর স্থাপন করে মিষ্টি লেবুর গ্রাফটিং তৈরি করা হয়। রুটস্টক হিসেবে ১.০ হতে ১.৫ বছর বয়সের সুস্থ, সবল ও সোজাভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত চারা নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত মাতৃগাছ হতে সায়ন তৈরির জন্য দুটি চোখসহ ৫-৬ সেমি লম্বা ও ৮-৯ মাস বয়সের ডাল সংগ্রহ করতে হবে। মধ্য-বৈশাখ থেকে মধ্য-ভাদ্র (মে থেকে আগস্ট) মাস পর্যন্ত গ্রাফটিং করা যায়। ভিনিয়ার ও ক্লেফট গ্রাফটিং উভয় পদ্ধতিতেই মিষ্টি লেবুর কলম তৈরি করা যায়। সাধারণত কলম করার ১০-১৫ দিনের মধ্যে রুটস্টক ও সায়নের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় এবং সায়নের চোখ ফুটে কুশি বের হয়। কলম হতে একাধিক ডাল বের হলে সুস্থ সবল ও সোজাভাবে বেড়ে উঠা ডালটি রেখে বাকিগুলো কেটে ফেলতে হবে। আদিজোড় থেকে উৎপন্ন কুশি নিয়মিতভাবে অপসারণ করতে হবে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন ও তৈরি

সারাদিন রোদ পড়ে এবং বৃষ্টির পানি জমে না এমন উঁচু বা মাঝারী উঁচু জমি মিষ্টি লেবু চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত জমিটি পর্যায়ক্রমিক চাষ ও মই দিয়ে জমি সমান করে নিতে হবে। জমি থেকে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং আশে পাশে উঁচু গাছ থাকলে তার ডালপালা ছেঁটে দিতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি ও সময়

সমতল ভূমিতে বর্গাকার বা ষড়ভূজী পদ্ধতিতে এবং পাহাড়ী এলাকায় কন্টুর পদ্ধতিতে চারা/কলম রোপণ করা হয়। সাধারণত মধ্য-বৈশাখ থেকে মধ্য-ভাদ্র মে-আগস্ট) মাসের মধ্যে মিষ্টি লেবুর চারা লাগানো উত্তম। তবে পানি সেচ নিশ্চিত করা গেলে বছরের অন্যান্য সময়ও চারা লাগানো যেতে পারে।

চারা/কলম রোপণ ও পরিচর্যা

গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারা/কলমটি গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে রোপণ করতে হবে। রোপণের পরপর খুটি দিয়ে চারা/কলমটি খুটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। অতঃপর প্রয়োজনমত পানি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগ

গাছের যথাযথ বৃদ্ধির জন্য সময়মত, সঠিক পরিমাণে এবং সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। বয়সভেদে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হলো।

গাছের বয়স (বছর)	গোবর সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)	জিংক সালফেট (গ্রাম)	বরিক এসিড (গ্রাম)
১-২	১০-১২	২০০-৩০০	১০০-১৫০	১০০-১৫০	১০	১০
৩-৪	১২-১৫	৩০০-৪৫০	১৫০-২০০	১৫০-২০০	১৫	১২
৫-৭	১৫-১৮	৪৫০-৬০০	২০০-৩০০	২০০-২৫০	২০	১৫
৮-১০	১৮-২০	৬০০-৭০০	৩০০-৪৫০	২৫০-৩০০	২৫	১৮
১০ এর অধিক	২০-২৫	৭৫০	৫০০	৪৫০	৩০	২২

প্রতিবছর মধ্য-ফাল্গুন থেকে মধ্য-চৈত্র (মার্চ), বর্ষার পূর্বে মধ্য-বৈশাখ থেকে মধ্য-জ্যৈষ্ঠ (মে) এবং বর্ষার পর মধ্য-ভাদ্র থেকে মধ্য-আশ্বিন (সেপ্টেম্বর) মাসে তিন কিস্তিতে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে সেচের ব্যবস্থা না থাকলে বর্ষার আগে ও পরে দুই কিস্তিতে সার প্রয়োগ করা ভাল।

আগাছা দমন ও মালচ প্রয়োগ

বর্ষার শেষে সার প্রয়োগের পর গাছের গোড়া থেকে একটু দূরে বিভিন্ন লতাপাতা বা খড় দ্বারা বৃত্তাকারে মালচ করে দিলে আগাছা দমনসহ শুষ্ক মৌসুমে আর্দ্রতা সংরক্ষিত হয়। সাধারণত বর্ষার শুরুতে ও বর্ষার শেষে সম্পূর্ণ বাগানে হালকা চাষ দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন

ভাল ফলনের জন্য খরার সময় বা শুষ্ক মৌসুমে নিয়মিত সেচ দেয়া একান্ত দরকার। বর্ষার সময় গাছের গোড়ায় যাতে পানি না জমে সে জন্য দ্রুত পানি নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ

মিষ্টি লেবু গাছের জন্য ডাল ছাঁটাই অপরিহার্য। গাছ লাগানের পর ফল ধরার পূর্ব পর্যন্ত ধীরে ধীরে ডাল ছেঁটে গাছকে নির্দিষ্ট আকার দিতে হবে যাতে গাছ চারদিকে ছড়াতে পারে। কারণ পার্শ্ব ডালগুলিতে কম বেশি ধরে। কাণ্ডের ১ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সব ডাল ছাঁটাই করতে হবে। ডাল ছাঁটাই করার পর ডালের কাটা অংশে বর্দোপেস্টের প্রলেপ দিতে হবে। এছাড়া, পানি তেউড় বা Water sucker উৎপন্ন হওয়ামাত্র কেটে ফেলতে হবে। মরা, শুকনা এবং রোগ ও পোকামাকড় আক্রান্ত ডালপালা কেটে পরিষ্কার রাখতে হবে।

ফল পাতলাকরণ ও ব্যাগিং

'বারি মিষ্টি লেবু-১' এর গাছে প্রতিবছর প্রচুর সংখ্যক ফল আসে। সমস্ত ফল রাখা হলে ফল আকারে ছোট ও নিম্ন মানের হয়। এজন্য প্রতি পুষ্প মঞ্জরীতে সুস্থ ও সতেজ দেখে দু'টি করে ফল রেখে বাকিগুলো ছোট থাকা অবস্থায়ই (মার্বেল অবস্থা) ছাঁটাই করা দরকার। কলমের গাছ প্রথম বা দ্বিতীয় বছর থেকে ফল দিতে শুরু করে। গাছের বৃদ্ধির জন্য ১ম বছর ফল না রাখাই ভাল, দ্বিতীয় বছর অল্প সংখ্যক ফল রাখা যেতে পারে। এভাবে পর্যায়ক্রমে গাছের অবস্থা বিবেচনা করে ফল রাখতে হবে। ফলের বর্ণ সবুজ হওয়ায় পাখি ও পোকার আক্রমণ কম হয়। তবে পরিপক্কতার পূর্বে ব্যাগিং করলে অবাঞ্ছিত পোকামাকড়ের আক্রমণ রোধ করা যায়।

বাতাবিলেবু

ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ ফল বাতাবিলেবু বাংলাদেশের জন্য একটি সম্ভাবনাময় ফসল। কৃষকেরা অল্প আয়াসে চাষ করতে পারে। দেশের সব এলাকাতেই এর চাষ হয় তবে সিলেটে বেশি হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে বাতাবিলেবুর মোট উৎপাদন প্রায় ৫৬ হাজার টন।

বাতাবিলেবুর গাছ

বাতাবিলেবুর জাত

বারি বাতাবিলেবু-১

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত বাতাবিলেবুর জার্মপ্লাজম মূল্যায়ন করে 'বারি বাতাবিলেবু-১' জাতটি ১৯৯৭ সালে অনুমোদন করা হয়। এ জাতের পাতা বড় আকৃতির গাঢ় সবুজ। নিয়মিত ফল ধরে। ফলের আকৃতি প্রায় গোলাকার (টিএসএস ৯.২০%)। ফলের ওজন ৯০০-১১০০ গ্রাম। ফলের আকার মাঝারী। ফলের কোষ সংখ্যা ১৩-১৪টি। ভক্ষণযোগ্য অংশ ৪৫%। খোসার পুরুত্ব ২.০-২.৫ সেমি।

ফল সুস্বাদু ও সামান্য তিতা, বেশ রসালো, শাঁসের রং লালচে, মিষ্টতা মাঝারী। শাঁস বেশ নরম। পাকা ফলর রং হলুদ। বীজের রং বাদামী এবং আকৃতি চেপ্টা। প্রতি গাছে ৪৫-৫৫টি ফল ধরে। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৪-১৬ টন। দেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী।

বারি বাতাবিলেবু-১

বারি বাতাবিলেবু-২

দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত বাতাবিলেবুর জার্মপ্লাজম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি উন্নত জাত 'বারি বাতাবিলেবু-২' ১৯৯৭ সালে অনুমোদন করা হয়। গাছের আকৃতি ছাতার মত। পাতা গাঢ় সবুজ, ডানাযুক্ত বৃন্তাকার। টিএসএস ১১.৩৫%। মোট এসিড ১.০৫%। ফলের ওজন ৭৫০-৭৮০ গ্রাম। ফলের আকার ১১.০০ × ১২.৩০ সেমি। ফলের কোষ সংখ্যা ১৩-১৫টি, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৪০% এবং খোসার পুরুত্ব ১.২-১.৪ সেমি। বীজের সংখ্যা ১১০-১২০টি।

ফল সুস্বাদু, বেশ রসালো, শাঁসের রং লালচে এবং বেশ মিষ্টি। শাঁস নরম এবং পাকা ফলের রং হলুদ। বীজের রং বাদামী, আকৃতি চেপ্টা। প্রতি গাছে ৪০-৫০টি ফল ধরে। হেক্টরপ্রতি ফলন ১২-১৪ টন। দেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী।

বারি বাতাবিলেবু-২

বারি বাতাবিলেবু-৩

অভ্যন্তরীণ জরিপের মাধ্যমে দেশের উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজমের ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উন্নত জাত বারি 'বাতাবিলেবু-৩' ২০০৩ সালে অবমুক্ত করা হয়।

গাছের আকার মাঝারী, পাতা গাঢ় সবুজ ও হৃদপিণ্ডাকার ডানাযুক্ত। প্রতিবছর নিয়মিত ফল ধরে। ফল উপবৃত্তাকার ও মাঝারী ধরনের। ফলের ওজন ১০০০-১১৫০ গ্রাম। পাকা ফলের খোসা হলদে বর্ণের, পাতালা (১.২৫-১.৩০ সেমি পুরু) যা খুব সহজেই শাঁস থেকে ছাড়ানো যায়। প্রতি ফলে কোষের সংখ্যা ১৪-১৫টি।

ফলের শাঁস অত্যন্ত রসালো, নরম, মিষ্টি, সম্পূর্ণ তিতাবিহীন, গোলাপী বর্ণের এবং খেতে সুস্বাদু। টিএসএস (ব্রিক্সমান) ৮.৬% ফলের ভক্ষণযোগ্য অংশ ৫৫-৬০%, গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ১০০-১১০টি, প্রতি ফলে বীজের সংখ্যা ৭০-৭৫টি। বীজ হালকা বর্ণের ও চেপ্টা আকৃতির। হেক্টরপ্রতি ফলন ২৫-৩০ টন। দেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী।

বারি বাতাবিলেবু-৩

বারি বাতাবিলেবু-৪

দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত জাতটি 'বারি বাতাবিলেবু-৪' নামে ২০০৪ সালে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে।

গাছের আকৃতি ছাতার মত। পাতা গাঢ় সবুজ, ডানাযুক্ত বৃত্তাকার। গাছে নিয়মিত ফল ধরে। ফলের আকৃতি গোলাকার, মাঝারী ধরনের। টিএসএস ১১.৬%। মোট এসিড ০.৬০%। ফলের ওজন ৮৫০-১১০০ গ্রাম। ফলের কোষ সংখ্যা ১২-১৪টি।

ফল সুস্বাদু, বেশ রসালো, শাঁসের রং সাদা এবং বেশ মিষ্টি। কোন তিতাভাব নেই। পাকা ফলের রং হলুদাভ। প্রতিটি গাছে ৪০-৫০টি ফল ধরে। এটা একটি নাবী জাত। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৫-২০ টন। দেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী।

বারি বাতাবিলেবু-৪

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি

গভীর, হালকা, দোআঁশ পলি নিষ্কাশন সম্পন্ন মাটি লেবু চাষের জন্য উত্তম। মধ্যম অম্লীয় মাটিতে বাতাবিলেবু ভাল জন্মে।

জমি নির্বাচন ও তৈরি

পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা সম্পন্ন উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমি বাতাবিলেবু চাষের জন্য উত্তম। জমি নির্বাচনের পর জমি চাষ দিয়ে আগাছামুক্ত করে চারা রোপণের জন্য গর্ত তৈরি করা হয়।

চারা/কলম তৈরি ও নির্বাচন

পার্শ্বকলম ও গুটি কলমের মাধ্যমে বাতাবিলেবুর কলম তৈরি করা যায়। সাধারণত ৮-১০ মাস বয়সের বাতাবিলেবুর চারা বাডিং ও গ্রাফটিংয়ের জন্য আদিজোড় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। রোপণের জন্য সোজা ও দ্রুত বৃদ্ধি সম্পন্ন চারা/কলম নির্বাচন করতে হয়।

রোপণের সময়

মধ্য জ্যৈষ্ঠ-মধ্য আশ্বিন (জুন-সেপ্টেম্বর) মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে অধিক বৃষ্টিপাতের সময় চারা/কলম রোপণ না করাই ভাল। সেচ সুবিধা থাকলে সারা বছরই বাতাবিলেবুর চারা/কলম রোপণ করা চলে।

গর্ত তৈরি

চারা/কলম রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ৬ × ৬ মিটার দূরত্বে ৬০ × ৬০ × ৫০ সেমি আকারের গর্ত করে কয়েকদিন উন্মুক্ত অবস্থায় রেখে দিতে হয়। কলম রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে গর্তপ্রতি ১৫-২০ কেজি পচা গোবর, ৩০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০-৩০০ গ্রাম এমওপি ও ২০০ গ্রাম জিপসাম সার গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত বন্ধ করে রেখে দিতে হবে। মাটিতে রসের পরিমাণ কম থাকলে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

চারা/কলম রোপণ

গর্তে সার প্রয়োগের ১৫-২০ দিন পর গোড়ার মাটিসহ চারা গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে রোপণ করা হয়। চারা রোপণের পর হালকা পানি সেচ, খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হয়।

গাছে সার প্রয়োগ

বয়সভেদে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ

সার	গাছের বয়স			
	১-২ বছর	৩-৪ বছর	৫-১০ বছর	১০ বছরের উর্ধে
গোবর (কেজি)	৭-১০	১০-১৫	২০-২৫	২৫-৩০
ইউরিয়া (গ্রাম)	১৭৫-২২৫	২৭০-৩০০	৫০০-৬০০	৬০০-৭০০
টি এস পি (গ্রাম)	৮০-৯০	১৪০-১৭০	৪০০-৪৫০	৪৫০-৫০০
এমওপি (গ্রাম)	১৪০-১৬০	৪০০-৫০০	৫০০-৫৫০	৬০০-৬৮০

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

সার একেবারে গাছের গোড়ায় না দিয়ে যত দূর পর্যন্ত ভালভাবে গাছের ডালপালা বিস্তার লাভ করে সে এলাকায় মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। উল্লিখিত সার ৩ কিস্তিতে ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি), মধ্য-বৈশাখ থেকে মধ্য-জ্যৈষ্ঠ (মে) ও মধ্য আশ্বিন থেকে মধ্য-কার্তিক (অক্টোবর) মাসে প্রয়োগ করতে হয়।

পানি সেচ ও নিকাশ

ফুল আসা ও ফল ধরার সময় পানির অভাব হলে ফল ঝরে পড়া ও সূর্য পোড়া দাগ দেখা যায়। তাই শুষ্ক মৌসুমে ২১ দিন পর পর ২-৩টি সেচ দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। বর্ষার সময় গাছের গোড়ায় যাতে পানি জমতে না পারে সে জন্য পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হয়।

অঙ্গ ছাঁটাই

নতুন রোপণকৃত গাছে আদিজোড় হতে উৎপাদিত কুশি ভেঙ্গে দিতে হবে। গাছটির অবকাঠামো মজবুত করার লক্ষ্যে গোড়া থেকে ১ মিটার উঁচু পর্যন্ত কোন ডালপালা

রাখা চলবে না। এক থেকে ১.৫ মিটার উপরে বিভিন্ন দিকে ছড়ানো ৪-৫টি শাখা রাখতে হবে যাতে গাছটির সুন্দর একটি কাঠামো তৈরি হয়। প্রতি বছর ফল সংগ্রহের পর মরা, পোকা-মাকড় ও রোগাক্রান্ত ডাল ছাঁটাই করতে হয়। ডাল ছাঁটাইয়ের পর কর্তিত স্থানে অবশ্যই বর্দোপেস্টের প্রলেপ দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ

ফল কিছুটা হলদে বর্ণ ধারণ করলে মধ্য-ভাদ্র থেকে মধ্য-কার্তিক (সেপ্টেম্বও থেকে নভেম্বর) ফল সংগ্রহ করা যায়। বাতাবিলেবু পাকার পরও দীর্ঘ দিন গাছে সংরক্ষণ (Tree storage) করা যায়।

সাতকরা

সাতকরা (*Citrus macroptera*) একটি লেবু জাতীয় অপ্রধান ফল। অপ্রধান হলেও সিলেট অঞ্চলে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। কমলালেবু ও লেবুর মত এর রস বা শাঁস খাওয়া হয় না। ফলের খোসা বিভিন্ন ধরনের রান্নায় তরকারী হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

খোসার সুগন্ধ রান্নার মান বৃদ্ধি করে থাকে। খোসা দিয়ে উৎকৃষ্ট মানের আচার তৈরি হয়। সাতকরা ইংল্যান্ডে রপ্তানি হয়। প্রবাসী সিলেটবাসীরাই এ ফলের ভোক্তা।

সাতকরার জাত

বারি সাতকরা-১

স্থানীয় জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০০৪ সালে 'বারি সাতকরা-১' জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এটি উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। গাছ মাঝারী, মধ্যম ছড়ানো ও মধ্যম ঝোপালো। চৈত্র-বৈশাখ মাসে গাছে ফুল আসে এবং শীতের প্রারম্ভে (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর) ফল পাকতে শুরু করে। ফল মধ্যম আকারের (৩৩০ গ্রাম) কমলালেবুরমত চেপ্টা। পাকা

বারি সাতকরা-১

ফল হালকা হলুদ বর্ণের। বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য জেলাসমূহে চাষ উপযোগী। হেক্টরপ্রতি ফলন ১০ টন।

জলবায়ু ও মাটি

যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয় এমন আর্দ্র ও উঁচু পাহাড়ী অঞ্চলে সাতকরা ভাল জন্মে। উঁচু, উর্বর, গভীর সুনিষ্কাশিত এবং মৃদু অম্লভাবাপন্ন বেলে দোআঁশ মাটি সাতকরার জন্য উত্তম। এঁটেল মাটির পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা কম হওয়ায় সাতকরা চাষের অনুপযোগী। সাতকরা উৎপাদনের জন্য বার্ষিক ১৫০০-২৫০০ মিলি মিটার বৃষ্টিপাত এবং ২৫-৩০° সে. গড় তাপমাত্রা উপযোগী। সাতকরা চাষের জন্য মাটির আদর্শ অম্লক্ষারত্ব মান ৫.৫-৬.০।

বংশ বিস্তার

বীজ এবং অঙ্গজ দুই ভাবেই কমলার বংশ বিস্তার হয়। অঙ্গজ উপায়ে জোড় কলম (ভিনিয়ার ও ক্লেফট গ্রাফটিং) ও কুঁড়ি সংযোজন (টি-বাডিং) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

সাতকরার উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন ও তৈরি

সাতকরার জন্য উর্বর, গভীর, সুনিষ্কাশিত এবং মৃদু অম্লভাবাপন্ন বেলে দোআঁশ মাটি সম্বলিত উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। জমি তৈরির পূর্বে জমি হতে আগাছা ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় গাছপালা অপসারণ করতে হবে। সমতল ভূমিতে আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে এবং পাহাড়ি অঞ্চলে কোদালের সাহায্যে জমি তৈরি করতে হবে। পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ের ঢালে সিঁড়ি (ধাপ) তৈরি করে সাতকরার চারা লাগাতে হবে। সিঁড়ি তৈরি করা সম্ভব না হলে পাহাড়ের ঢালে নির্দিষ্ট দূরত্বে গোলাকার বা অর্ধচন্দ্রাকৃতি আকারের বেড তৈরি করে গাছ লাগানো যেতে পারে।

গর্ত তৈরি, চারা/কলম রোপণ ও পরিচর্যা

চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে উভয় দিকে ৫-৬ মিটার দূরত্বে ৭৫×৭৫×৭৫ সেমি মাপের গর্ত করতে হবে। প্রতি গর্তে ১৫ কেজি কম্পোস্ট বা পচা গোবর, ৩-৫ কেজি

ছাই, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি এবং ২৫০ গ্রাম চুন গর্তের উপরের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে পানি দিতে হবে। গর্ত ভর্তি করার ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে ১ বছর বয়সের নির্বাচিত চারাটি সোজাভাবে লাগিয়ে গোড়ার মাটি সামান্য চেপে দিতে হয় এবং লাগানোর পরপরই খুঁটি ও পানি দেয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাস সাতকরার চারা/কলম রোপণের উপযুক্ত সময়।

ডাল ছাঁটাই

নতুন রোপণকৃত গাছে আদিজোড় হতে উৎপাদিত কুঁশি ভেঙ্গে দিতে হবে। গাছটির অবকাঠামো মজবুত করার লক্ষ্যে গোড়া থেকে ১ মিটার উঁচু পর্যন্ত কোন ডালপালা রাখা চলবে না। এক থেকে দেড় মিটার উপরে বিভিন্ন দিকে ছড়ানো ৪-৫টি শাখা রাখতে হবে যাতে গাছটির সুন্দর একটি কাঠামো তৈরি হয়। প্রতি বছর ফল সংগ্রহের পর মরা, পোকা-মাকড় ও রোগাক্রান্ত ডাল ছাঁটাই করতে হয়। ডাল ছাঁটাইয়ের পর কর্তিত স্থানে অবশ্যই বর্দোপেস্টের প্রলেপ দিতে হবে।

সার প্রয়োগ

গাছের যথাযথ বৃদ্ধির জন্য সময়মত, সঠিক পরিমাণে এবং সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। সাতকরার জন্য প্রতি বছর পচা গোবর, ইউরিয়া, টিএসপি এবং এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। বয়সভেদে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ নিম্নে দেয়া হলঃ

সার	গাছের বয়স			
	১-২ বছর	৩-৪ বছর	৫-১০ বছর	১০ বছরের উর্ধ্বে
গোবর (কেজি)	৭-১০	১০-১৫	২০-২৫	২৫-৩০
ইউরিয়া (গ্রাম)	১৭৫-২২৫	২৭০-৩০০	৫০০-৬০০	৬০০-৭০০
টি এস পি (গ্রাম)	৮০-৯০	১৪০-১৭০	৪০০-৪৫০	৪৫০-৫০০
এমওপি (গ্রাম)	১৪০-১৬০	৪০০-৫০০	৫০০-৫৫০	৬০০-৬৮০

সার একেবারে গাছের গোড়ায় না দিয়ে যত দূর পর্যন্ত ভালভাবে গাছের ডালপালা বিস্তার লাভ করে সে এলাকায় মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। উল্লিখিত সার ৩ কিস্তিতে ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি), মধ্য বৈশাখ থেকে মধ্য-জ্যৈষ্ঠ (মে) ও মধ্য-আশ্বিন থেকে মধ্য-কার্তিক (অক্টোবর) মাসে প্রয়োগ করতে হয়।

আগাছা দমন

গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জমিকে আগাছামুক্ত রাখা দরকার, বর্ষার শুরুতে ও বর্ষার শেষে হালকাভাবে কোদাল দ্বারা কুপিয়ে বা চাষ দিয়ে আগাছা দমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন

বয়স্ক গাছে খরা মৌসুমে ২-৩টি সেচ দিলে সাতকরার ফলন ও গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। গাছের গোড়ায় পানি জমলে মাটি বাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। তাই অতিরিক্ত পানি নালার মাধ্যমে নিষ্কাশন করে দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ

পরিপক্ক হলে সাতকরা হালকা সবুজ বর্ণ ধারণ করে এবং এর খোসা তুলনামূলকভাবে মসৃণ হয়ে আসে। গাছ হতে ফল সংগ্রহ করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে ফলগুলোতে যাতে আঘাত না লাগে। গাছ হতে ফল সংগ্রহের জন্য হারভেস্টার ব্যবহার করা উত্তম।

আমড়া

আমড়া একটি জনপ্রিয় ও উপাদেয় ফল। বাংলাদেশে দুই প্রজাতির আমড়া পাওয়া যায়। যেমন, বিলাতি আমড়া (Golden apple) ও দেশি আমড়া (Hogplum)। বিলাতি আমড়া দেশের প্রায় সব স্থানেই কম বেশি জন্মে তবে বরিশাল অঞ্চলে এর চাষ বেশি হয় বলে এটা বরিশালী আমড়া নামে সমধিক পরিচিত। আমড়া একটি পুষ্টি সমৃদ্ধ ফল। আমড়াতে প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে ৮৩ ভাগ পানি, ১.১ গ্রাম আমিষ, ১৫.০ গ্রাম শ্বেতসার, ০.১০ গ্রাম স্নেহ, ৮০০ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন, ০.২৮ মিলিগ্রাম থায়াসিন, ০.০৪ মিলিগ্রাম রাইবোফ্লাবিন, ৯২ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি, ৫৫ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম এবং ৩.৯ মিলিগ্রাম লৌহ থাকে।

বিলাতি আমড়া কাঁচা খাওয়া হয়। এটি খেতে টক-মিষ্টি স্বাদের হয়ে থাকে। বিলাতি এবং দেশি ২ ধরনের আমড়া থেকেই সুস্বাদু আচার, চাটনী ও জেলী তৈরি করা হয়।

ফলসহ আমড়া গাছ

আমড়ার জাত

বারি আমড়া-১ (বারমাসি আমড়া)

প্রায় সারা বছর ফল ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন 'বারি আমড়া-১' একটি নতুন জাতের আমড়া। বিদেশ থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতটি উদ্ভাবন করা হয় এবং ২০০৩ সালে অবমুক্ত করা হয়। এ জাতের আমড়ায় মধ্য-ফাল্গুন (মার্চ-এপ্রিল) থেকে ফুল আসা আরম্ভ হয় এবং মধ্য-কার্তিক (নভেম্বর) মাস পর্যন্ত ক্রমাগত ফুল আসে। মধ্য-ফাল্গুন থেকে মধ্য-চৈত্র (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) মাস ব্যতিরেকে বছরের দশ মাসেই গাছে ফুল বা ফল পাওয়া যায়।

'বারি আমড়া-১' জাতের আমড়ায় ১ বছর বয়সের চারাতেই ফুল ও ফল আসতে দেখা যায় এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে ফলন বৃদ্ধি পায়। এর গাছ বামন আকৃতির হয়। ফল ছোট (৬০ গ্রাম), ডিম্বাকার, দৈর্ঘ্য ৫.৫ সেমি, প্রস্থ ৪.৫ সেমি। ফলের শাঁস হালকা-সাদা, মধ্যম রসালো ও টক-মিষ্টি (ব্রিক্সমান ৭.০%)। ফলের খোসা পাতলা ও মসৃণ। বীজ ছোট, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৭৩%। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৫-১৭ টন। দেশের সব এলাকায় চাষোপযোগী।

বারি আমড়া-১

বারি আমড়া-২

দেশের উপকূলীয় অঞ্চল থেকে জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'বারি আমড়া-২' জাতটি উদ্ভাবন করা হয় এবং ২০০৭ সালে অবমুক্ত করা হয়।

জাতটি উচ্চ ফলনশীল এবং প্রতিবছর ফল দেয়। গাছ লম্বাকৃতির, ফল বড়, অত্যন্ত সুস্বাদু (ব্রিক্সমান ৯%) এবং ফলের গড় ওজন ৯৫-১০০ গ্রাম। এর খাদ্যোপযোগী অংশ প্রায় ৬০ শতাংশ। হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ১৬-১৮ টন। জাতটি দেশের উপকূলীয় এলাকায় চাষোপযোগী।

বারি আমড়া-২

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও জলবায়ু

গভীর, সুনিষ্কাশিত, উর্বর দোআঁশ মাটি আমড়া চাষের জন্য উত্তম। আমড়া চাষে উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। গ্রীষ্ম মন্ডলীয় জলবায়ুতে আমড়া ভাল হয়। বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু আমাড়া চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।

বংশ বিস্তার

বীজ বা কলমের মাধ্যমে আমড়ার বংশ বিস্তার করা হয়। পরিপক্ক আমড়া বীজ থেকে শাঁস ছাড়িয়ে নিয়ে বালিতে রোপণ করতে হয়। চারা গজানোর পর ছোট অবস্থায় চারাগুলো তুলে কম্পোস্ট ও ভিটি বালি মিশ্রিত অন্য টবে স্থানান্তর করতে হয়। একটি বীজ থেকে এক বা একাধিক চারা হতে পারে। কম্পোস্ট ও ভিটিবালি মিশ্রিত টবে একবারে বীজ লাগিয়েও এই চারা উৎপাদন করা যায়। তবে এক্ষেত্রে চারার অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা কমে যায়। বীজের চারাতেও বংশগত গুণাগুণ ঠিক থাকে। কলমের মাধ্যমেও আমড়ার বংশ বিস্তার হয়ে থাকে। তবে এ ক্ষেত্রে দেশি আমড়ার চারা রুটস্টক হিসেবে ব্যবহার করে গ্রেফট পদ্ধতিতে আমড়ার কলম করা হয়।

জমি তৈরি

ভালভাবে চাষ ও মই দিয়ে জমি সমতল ও আগাছমুক্ত করে নিতে হবে। চারা রোপণের জন্য সমতল ভূমিতে বর্গাকার, আয়তাকার বা কুইনকান্স এবং পাহাড়ি জমিতে কন্টুর বা ম্যাথ পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। আমড়া চারা রোপণের জন্য ৬০ × ৬০ × ৬০ সেমি গর্ত করে ২০ কেজি জৈব সার, ২০০ গ্রাম টিএসপি এবং ৫০ গ্রাম জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে। বৃষ্টির মৌসুমের প্রারম্ভে অর্থাৎ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস (এপ্রিল-মে) চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়। তবে অন্য সময়ও চারা লাগানো যায়। বারি আমড়া-১ জাতের আমড়া বামন আকৃতির হওয়ায় ৪-৫ মিটার দূরত্বে লাগানো উত্তম। গর্ত তৈরির ১৫-৩০ দিন পর চারার গোড়ার বলসহ গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগাতে হবে। চারা রোপণের পর হালকা সেচ, খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ

আমড়া গাছে বছরে ২ বার সার প্রয়োগ করা উচিত। প্রথম কিস্তি বর্ষার প্রারম্ভে (এপ্রিল-মে) এবং ২য় কিস্তি বর্ষার শেষে মধ্য-শ্রাবণ থেকে মধ্য-ভাদ্র (আগস্ট-সেপ্টেম্বর) দিতে হবে। মাটিতে 'জো' অবস্থায় সার প্রয়োগ করতে হয়। গাছের বৃদ্ধির সাথে সারের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

গাছের বয়স	জৈব সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)	জিপসাম (গ্রাম)
১-২ বছর	৫-১০	১০০	১৫০	১০০	৫০
৩-৪ বছর	১০-১৫	১৫০	২০০	১৫০	৬০
৫-৬ বছর	১৫-২০	২০০	২৫০	২০০	৭৫
৭-১০ বছর	২০-২৫	২৫০	৩০০	২৫০	৯০
১০ বছর তদূর্ধ্ব	২৫-৩০	৩০০	৩৫০	৩০০	১০০

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

দুই-তিন মাস অন্তর ৪ কিস্তিতে (বৈশাখ, আষাঢ়, আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ) উক্ত সার প্রয়োগ করতে হবে। বারি আমড়া-২ এর ক্ষেত্রে সারের পরিমাণ দ্বিগুণ হবে এবং বছরে দুই কিস্তিতে (বৈশাখ ও অগ্রহায়ণ) সার প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

গাছের বৃদ্ধির জন্য শুকনা মৌসুমে সেচ প্রয়োগ করা উত্তম। ফলন্ত গাছের বেলায় আমড়ার ফুল ফোটার শেষ পর্যায়ে এবং মটর দানার সময়ে একবার, স্প্রিংকলার বা বেসিন পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ করতে হবে। গাছে সার প্রয়োগের পর হালকা সেচ প্রয়োগ করা হলে সুফল পাওয়া যায়।

ফুল ও ফল ছাঁটাই

১-২ বছর পর্যন্ত গাছে কোন ফল না রাখাই উত্তম। তাই এ সময় ফুল ধারণ করলেও ফুল ফেলে দেয়া হলে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়। ২ বছর পর গাছে প্রচুর পরিমাণ ফল হয়। বারি আমড়া-১ এর গাছে ফলের আধিক্য থাকে বলে ২০-৩০% ফল ছাঁটাই করে ফেলা উচিত। এতে গাছের অন্যান্য ফলের বৃদ্ধি বেশি হয় এবং ফলের গুণগত মানও উন্নত হয়।

ফল সংগ্রহ

খাওয়ার জন্য পুষ্ট ফল গাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। ফল পুষ্ট হলে আমড়ার রং সবুজ এবং গায়ে হালকা বাদামী প্যাচ সৃষ্টি হয়। চারা তৈরির জন্য আমড়া গাছে কিছুটা পাকিয়ে নেয়াই উত্তম। পাকা হালকা হলুদ রং ধারণ করে। পুষ্ট ফলের বীজ থেকেও চারা তৈরি করা যায়।

অন্যান্য পরিচর্যা

হগপ্লাম বিটল পোকা দমন

এ পোকা কচি পাতা খেয়ে গাছকে পত্রশূন্য করে ফেলে। ফলে গাছ দুর্বল হয়ে যায় এবং ফলন কমে যায়। এ পোকার গায়ে লালচে ফোঁটারমত দাগ দেখা যায়। এপ্রিল-আগস্ট পর্যন্ত এ পোকার প্রাদুর্ভাব বেশি থাকে।

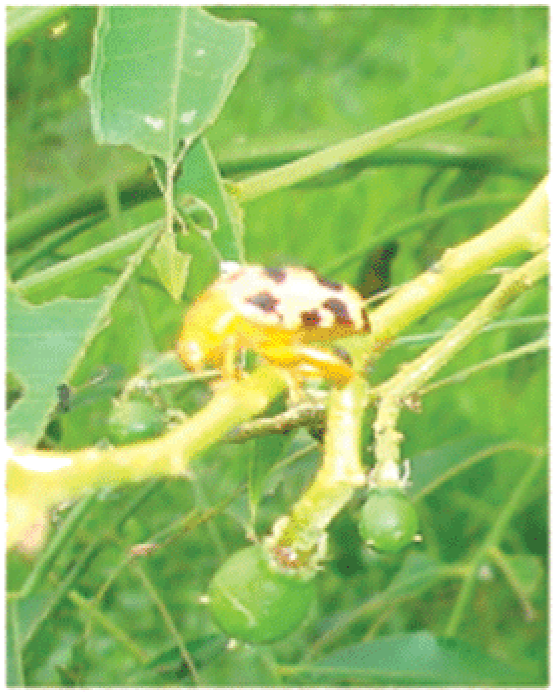

হগপ্লাম বিটল পোকা

প্রতিকার

- পোকার সংখ্যা কম হলে হাত দিয়ে ধরে মেরে ফেলা যায়।
- লার্ভা অবস্থায় গুচ্ছাকারে থাকার সময় পাতাসহ সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে।
- আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে সুমিথিয়ন ৫০ ইসি অথবা রগর ৪০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করে এই পোকা দমন করা যায়।

জামরুল

জামরুল বেশ রসালো এবং হালকা মিষ্টি স্বাদযুক্ত ফল। গ্রীষ্মকালে এর কদর বেশি। এটি একটি ভিটামিন বি-২ সমৃদ্ধ ফল। জামরুল বহুমূত্র রোগীর তৃষ্ণা নিবারণে উপকারী।

ফলসহ জামরুল গাছ

জামরুলের জাত

বারি জামরুল-১

'বারি জামরুল-১' জাতটি প্রতিবছর ফলধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন। এ জাতটি বাংলাদেশে চাষের জন্য ১৯৯৭ সালে অনুমোদিত হয়।

বারি জামরুল-১

এ জাতের পাকা ফল দেখতে আকর্ষণীয় মেরুন বর্ণের এবং খেতে সুস্বাদু। এ জাতের জামরুল আঁশবিহীন ও মধ্যম রসালো।

ফুল আসার সময় মধ্য-মাঘ থেকে মধ্য-চৈত্র (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) এবং ফল আহরণের সময় মধ্য-চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ (এপ্রিল-মে) মাস। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ১১০০-১৪০০টি। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০ টন। ফল চুঙ্গাকৃতির হয়। ফলের ওজন ৩৪-৪৫ গ্রাম। ফলের শাঁস সবুজাভ সাদা। প্রায় আঁশহীন, মধ্যম মিষ্টি (ব্রিক্স মান ৬.৫%), শাঁস ফলের ৯৭%। ফলের ত্বক মসৃণ। বীজ খুব ছোট ও হালকা। জামরুলের এ জাতটি সারা দেশে চাষের জন্য উপযোগী।

বারি জামরুল-২

অধিকাংশ জামরুল বছরে একবার ফল প্রদান করে থাকে। কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম জামরুলের একটি নতুন জাত উদ্ভাবন করেছে যা বছরে তিনবার ফল প্রদান করে থাকে যা 'বারি জামরুল-২' নামে জাতীয় বীজবোর্ড কর্তৃক নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়েছে। 'বারি জামরুল-২' নিয়মিত প্রচুর ফল উৎপাদনকারী উন্নত জাত। গাছ মাঝারী, অত্যধিক ঝোপালো এবং বছরে ৩ বার ফল দেয়। মধ্য-ফাল্গুন, মধ্য-বৈশাক এবং আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগে 'বারি জামরুল-২' হতে ফল আহরণ করা যায়।

ফল চুঙ্গাকৃতির, পাকা ফল আকর্ষণীয় মেরুন বর্ণের এবং খেতে সুস্বাদু, রসাল ও মিষ্টি (ব্রিক্সমান ৭%)। ফলের গড় ওজন ৪০ গ্রাম, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৯৮%। গাছপ্রতি ২০০০-২৫০০টি ফল হয়। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-২৫ টন। জাতটি দেশের সর্বত্র চাষের উপযোগী।

বারি জামরুল-২

উৎপাদন প্রযুক্তি

চারা তৈরি

সাধারণত শাখা কলম ও গুটি কলমের মাধ্যমে জামরুলের বংশ বিস্তার করা হয়।

চারা রোপণ

মধ্য-জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য-আষাঢ় (জুন) মাসে ১ × ১ × ১ মিটার গর্ত করে তা ৩ সপ্তাহ উন্মুক্ত রাখতে হবে। তার পর ১০-১৫ কেজি পচা গোবর, ২৫০ গ্রাম টিএসপি এবং ২৫০ গ্রাম এমওপির মিশ্রণ প্রতি গর্তে প্রয়োগ করতে হবে এবং চারা লাগাতে হবে। সাধারণত বাড়ির আঙ্গিনায় ২/১টি জামরুলের চারা লাগানো হয়। চারা ৫-৬ মিটার দূরে লাগাতে হবে।

সারের পরিমাণ

বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রতিটি গাছের জন্য সারের পরিমাণ নিম্নরূপ হবে।

গাছের বয়স	জৈব সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
১-৩	১৫-২০	২০০-২৫০	২০০-২৫০	২০০-২৫০
৪-৭	৪৫-৬০	৬০০-৭৫০	৬০০-৭৫০	৬০০-৭৫০
৭-১০	৭০-৮০	৮০০-১০০০	৮০০-১০০০	৮০০-১০০০

সার প্রয়োগ

সবটুকু সার দুই ভাগ করে মধ্য-বৈশাখ থেকে মধ্য-আষাঢ় (মে-জুন) ও মধ্য-ভাদ্র থেকে মধ্য-কার্তিক (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) মাসে ২ বার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের চতুর্দিকে বৃত্তাকার নালা করে নালায় সার প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পর নালা মাটি দিয়ে ভরাট করতে হবে।

পরিচর্যা

বছরে ২ বার গাছের গোড়ার মাটি হালকাভাবে কুপিয়ে দিতে হবে। কলমের গাছের নিচের দিকের কিছু শাখা-প্রশাখা কেটে দিতে হবে। খরা মৌসুমে গাছে ২-৩ বার সেচ দেওয়া ভাল।

সফেদা

সফেদা বাংলাদেশের একটি সুস্বাদু চিনি সমৃদ্ধ ফল। বাংলাদেশে সর্বত্রই এ ফল জন্মায় তবে বৃহত্তর বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় সফেদার চাষ বেশি হয়। সঠিক পদক্ষেপের মাধ্যমে অতি সহজেই এদেশে সফেদার ব্যাপক চাষ করা সম্ভব। বিভিন্ন খনিজ পদার্থ এবং ভিটামিটন 'এ' ও 'সি' এর একটি ভাল উৎস হচ্ছে সফেদা।

ফলসহ সফেদা গাছ

সফেদার জাত

বারি সফেদা-১

'বারি সফেদা-১' উচ্চ ফলনশীল ও নিয়মিত ফলধারী জাতটি বাংলাদেশে চাষের জন্য ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। দেশীয় জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতটি নির্বাচন করা হয়। ফল দেখতে গোলাকার চেপ্টা। আকারে বেশ বড়। প্রতিটি ফলের ওজন ৮০-৯০ গ্রাম। ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ ৯০-৯৫%। ফলে টিএসএস এর পরিমাণ ১৪-১৬%। বীজের বর্ণ কালচে তামাটে, ডিম্বাকৃতির, তবে অঙ্কুরোদগমের দিকের মাথাটা কিছুট সরু। গাছপ্রতি বাৎসরিক ফলন ১১০-১২০ কেজি। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-২৫ টন।

কম বেশি সারা বছরই ফল ধরে। তবে ফুল ধরা ও ফল সংগ্রহের প্রাচুর্যতা বিবেচনায় সারা বছরকে দুটি মৌসুমে ভাগ করা যায়- (১) মধ্য-ভাদ্র থেকে মধ্য-বৈশাখ (সেপ্টেম্বর-এপ্রিল) এবং (২) মধ্য-চৈত্র থেকে মধ্য-ভাদ্র (এপ্রিল-আগস্ট) মাস।

প্রধানত চট্টগ্রাম এলাকায় জাতটি ভাল জন্মে। তবে অন্যান্য এলাকাতেও এর চাষ করা যায়।

বারি সফেদা-১

বারি সফেদা-২

'বারি সফেদা-২' উচ্চ ফলনশীল জাতটি বাংলাদেশের মধ্য-অঞ্চলে বিশেষত ঢাকা, টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও নরসিংদী এলাকায় চাষাবাদের জন্য ২০০৩ সালে অবমুক্ত করা হয়। দেশের মধ্য অঞ্চলসহ অন্যান্য এলাকাতেও এর চাষ করা যেতে পারে। সফেদার এ জাতটিতে নিয়মিত পৌষ থেকে বৈশাখ মাস (মধ্য-ডিসেম্বর থেকে মধ্য-এপ্রিল) পর্যন্ত সর্বাধিক ফল সংগ্রহ করা যায়। তবে বছরের অন্য সময়েও কিছু না কিছু ফল পাওয়া যায়। ভাদ্র থেকে কার্তিক মাসের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য ফলন পাওয়া যায়। জাতটি দেশীয় জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়।

ফল দেখতে গোলাকার। আকারে মাঝারী। প্রতিটি ফলের ওজন ৭০-৮০ গ্রাম। পাকা ফলের শাঁস লালচে-বাদামী বর্ণের, মোলায়েম, খেতে মিষ্টি ও সুস্বাদু, ব্রিক্সের পরিমাণ ১৮%। ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ ৮১.০%। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-২২ টন।

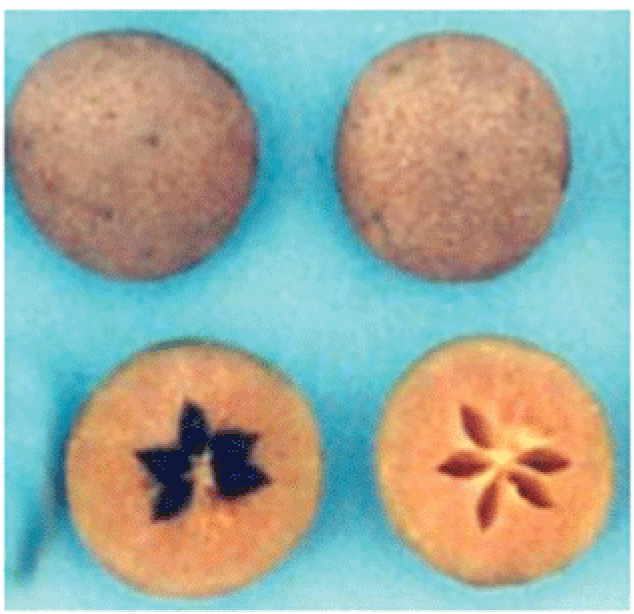

বারি সফেদা-২

বারি সফেদা-৩

ফল প্রদর্শণীর মাধ্যমে শনাক্তকৃত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০০৯ সালে 'বারি সফেদা-৩' নামে সফেদার নিয়মিত ফলধারী উচ্চ ফলনশীল এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। গাছ মাঝারী, মধ্যম খাড়া ও অধিক শাখা-প্রশাখা সমৃদ্ধ। গাছপ্রতি গড়ে ১৮০০টি ফল ধরে যার ওজন ২০০-২২৫ কেজি। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩০-৩৫ টন। জাতটি বছরে দুইবার ফল দেয় যা কার্তিক ও মাঘ মাসে আহরণোপযোগী হয়। ফল বেশ বড় (১১৭ গ্রাম), গোলাকৃতির ও বাদামী বর্ণের। শাঁস নরম, ধূসর বর্ণের, খুব রসালো ও মিষ্টি (গড় ওজন টিএসএস ২৩%) এবং সুগন্ধযুক্ত। ফলের ভক্ষণযোগ্য অংশ ৯১%।

সারাদেশে চাষোপযোগী জাতটি অমৌসুমে দেশি ফলের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

বারি সফেদা-৩

উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন

উঁচু নিকাশযুক্ত বেলে দোআঁশ ও দোআঁশ মাটি সফেদা চাষের জন্য বেশি উপযোগী। তবে অন্যান্য উঁচু জমিতেও চাষ করা যায়।

চারা উৎপাদন

গ্রাফটিং এর মাধ্যমে চারা তৈরি করে নিতে হবে। 'ক্ষিরণী' গাছের বীজ থেকে উৎপাদিত চারাকে সফেদার 'রুটস্টক' হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

চারা রোপণ

বাগান আকারে চাষের জন্য ৬ × ৬ মিটার হিসেবে রোপণের দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। এ হিসেবে হেক্টরপ্রতি চারা লাগবে ২৭৮টি। চারা লাগানোর ১০-১৫ দিন আগে নিয়ম অনুযায়ী গর্ত তৈরি করে নির্ধারিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের পরিমাণ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/গর্ত
টিএসপি	২৫০-৩০০ গ্রাম
এমওপি	২৪০-২৫০ গ্রাম
গোবর	১০-১৫ কেজি

চারা লাগানোর ১০-১৫ দিন আগে গর্তে সার ও মাটি মিশিয়ে রাখতে হবে। লাগানোর পরে চারায় প্রথম ২-৩ দিন প্রয়োজনমত পানি দিতে হবে এবং খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ

গাছের বয়স অনুসারে সারের পরিমাণ

সারের নাম	গাছের বয়স				
	১-৩ বছর	৪-৭ বছর	৮-১০ বছর	১১-১৫ বছর	১৫ বছরের উর্ধ্বে
গোবর/কম্পোস্ট (কেজি)	২০	২৫	৩০	৪০	৫০
ইউরিয়া (গ্রাম)	১০০-২০০	৩০০-৫০০	৬০০-৭০০	৮০০-৯০০	১০০০
টিএসপি (গ্রাম)	২০০	৩০০	৫০০	৭০০	৮০০
এমপি (গ্রাম)	১৫০	৩০০-৫০০	৬০০-৭০০	৮০০-৯০০	১০০০
জিপসাম (গ্রাম)	৫০	১০০	২০০	৩০০	৪০০

প্রয়োগ পদ্ধতি

উল্লিখিত পরিমাণ সার সমান তিন কিস্তিতে যথাক্রমে মার্চ, জুন ও সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে প্রয়োগ করতে হবে। গোবর বা কম্পোস্ট সার মার্চ ও সেপ্টেম্বরে দুই কিস্তিতে দেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে সার প্রয়োগের পর হালকা সেচ দিতে হবে।

পানি সেচ

সফেদা গাছ খরা সহ্য করতে পারে। তবে বেশি খরার সময় প্রয়োজনীয় সেচ দিলে ফলন ভাল হয়।

কামরাঙ্গা

অম্লমধুর স্বাদযুক্ত এবং ভিটামিন 'এ' ও 'সি' সমৃদ্ধ ফল কামরাঙ্গা আমাদের দেশে সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ফল। দেশের সর্বত্র বাড়ির আঙ্গিনায় ২/১টি কামরাঙ্গা গাছ দেখা যায়। গাজীপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ঢাকা, সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কামরাঙ্গা বেশি উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে কামরাঙ্গার মোট উৎপাদন ১০,৩০৯ টন।

কামরাঙ্গা ফল হতে জ্যাম, জেলী, মোরব্বা, চাটনি, আচার ইত্যাদি তৈরি করা হয়। কামরাঙ্গা একটি রপ্তানিযোগ্য ফল হওয়ায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদের প্রচুর সম্ভবনা রয়েছে।

মাটি ও জলবায়ু

যে কোন প্রকার মাটিতে এর চাষ করা যায়। তবে সুনিষ্কাশিত গভীর দোআঁশ মাটি কামরাঙ্গা চাষের জন্য উত্তম। উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু কমরাঙ্গা চাষের জন্য উপযোগী। বাংলাদেশের সকল অঞ্চলের আবহাওয়ায় কামরাঙ্গা চাষ করা সম্ভব। তবে দেশের পাহাড় অঞ্চলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কামরাঙ্গা চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। এদের কিছুটা ঠাণ্ডা সহ্য করার ক্ষমতা আছে।

কামরাঙ্গা গাছ

কামরাঙ্গার জাত

বারি কামরাঙ্গা-১

উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। গাছ মাঝারী, মধ্যম খাড়া ও ঝোপালো। বছরে তিনবার ফল দেয় (জুলাই-আগস্ট, নভেম্বর-ডিসেম্বর এবং ফেব্রুয়ারি)। ফল মাঝারী (গড় ওজন ৯৭ গ্রাম), লম্বাটে, রং হালকা হলুদ, শাঁস সাদা, রসালো, কচকচে মিষ্টি (ব্রিক্সমান ৭.৫%) এবং ভক্ষণযোগ্য অংশ ৯৯%। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩৫ টন। সমগ্র দেশে চাষোপযোগী এবং জাতটি রপ্তানিযোগ্য।

বারি কামরাঙ্গা-১

বারি কামরাঙ্গা-২

উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। গাছ মাঝারী, মধ্যম খাড়া ও মধ্যম ঝোপালো। বছরে তিনবার ফল দেয় (জানুয়ারি, জুলাই, এবং অক্টোবর)। ফল মাঝারী (গড় ওজন ১০০ গ্রাম), ডিম্বাকৃতির ও রং হালকা হলুদ। শাঁস সাদা, রসালো, কচকচে ও মিষ্টি (ব্রিক্সমান ৮.০%)। এবং ভক্ষণযোগ্য অংশ ৯৯%। হেক্টরপ্রতি ফলন ৫৩ টন। সমগ্র দেশে চাষোপযোগী এবং জাতটি রপ্তানিযোগ্য।

বারি কামরাঙ্গা-২

বংশ বিস্তার

বীজ ও অঙ্গজ পদ্ধতিতে কামরাঙ্গার বংশ বিস্তার হয়ে থাকে। বীজের গাছে মাতৃ গাছের গুণাগুণ পুরোপুরি বজায় থাকে না। বীজের গাছে ফল দিতে ৩-৪ বছর সময় লাগে। অঙ্গজ পদ্ধতিতে তৈরি চারা গাছে মাতৃ গাছের গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থাকে এবং লাগানোর পরবর্তী বছর থেকেই ফল দিতে শুরু করে। বীজ থেকে চারা তৈরি করে ১০-১২ মাস বয়স্ক সুস্থ সবল চারার উপর ৫-৬ মাস বয়স্ক উপজোড় ভিনিয়ার বা ফাটল পদ্ধতির মাধ্যমে কলম করা হয়। সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাস কলম করার উপযুক্ত সময়। এক বছর বয়স্ক কলমের চারা জমিতে রোপণের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন ও তৈরি

বর্ষায় পানি দাঁড়ায় না এমন উঁচু এবং মাঝারী উঁচু জমি কামরাঙ্গার জন্য নির্বাচন করতে হবে। উন্মুক্ত বা আংশিক ছায়াযুক্ত স্থানে কামরাঙ্গা চাষ করা যায়। বাগান আকারে চাষ করতে হলে নির্বাচিত জমি ভাল করে চাষ ও মই দিয়ে সমতল এবং আগাছামুক্ত করতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি

সমতল ভূমিতে বর্গাকার বা আয়তাকার এবং পাহাড়ী ভূমিতে কন্টুর পদ্ধতিতে চারা রোপণ করা হয়।

রোপণের সময়

চারা বা কলম রোপণের উপযুক্ত সময় মধ্য-জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য-ভাদ্র (জুন-সেপ্টেম্বর) মাস। তবে সেচ সুবিধা থাকলে আশ্বিন- কার্তিক (অক্টোবর) মাস পর্যন্ত চারা/কলম রোপণ করা যেতে পারে।

গর্ত তৈরি

চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ৭ × ৭ মিটার দূরত্বে ১ × ১ × ১ মিটার আকারের গর্ত করতে হবে। গর্তের উপরের মাটির সাথে ১০-১৫ কেজি জৈব সার, ২৫০ গ্রাম

টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি ও ১০০ গ্রাম জিপসাম সার ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে পরিমাণমত পানি দিতে হবে এবং এ অবস্থায় ১০-১৫ দিন রেখে দিতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি

গর্তের মাঝখানে চারা বসিয়ে গোড়ার মাটি একটু উঁচু করে দিতে হবে। চারা লাগানোর পর একটা শক্ত কাঠির সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে। তারপর সেচ দিতে হবে।

সার প্রয়োগ

বয়সভেদে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ

সারের নাম	গাছের বয়স			
	১-৩ বছর	৪-৬ বছর	৭ - ১০ বছর	১০ বছরের উর্ধ্বে
জৈব সার (কেজি)	১০-১৫	১৫-২০	২০-৩০	৩০-৪০
ইউরিয়া (গ্রাম)	৩০০-৪০০	৪০০-৬০০	৬০০-৮০০	৮০০-১০০০
টিএসপি (গ্রাম)	২৫০-৩০০	৩০০-৪০০	৪০০-৫০০	৫০০-৬০০
এমওপি (গ্রাম)	২৫০-৩০০	৩০০-৪০০	৪০০-৪৫০	৪৫০-৫০০

উল্লিখিত সার ২ কিস্তিতে প্রথমবার বর্ষার আগে ও দ্বিতীয়বার বর্ষার শেষের দিকে প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পর প্রয়োজনে পানি সেচ দিতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

চারা রোপণের পর ১ মাস নিয়মিত সেচ প্রদান করতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে এবং ফল ধরার পর প্রতি ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার সেচ দিলে ফল ঝরার মাত্রা কমে এবং ফলন বৃদ্ধি পায়। বর্ষা মৌসুমে বাগানে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ

নতুন রোপণকৃত চারা/কলমকে সুন্দর কাঠামো দেয়ার জন্য এর গোড়ার দিকের ডাল ছাঁটাই করতে হবে। প্রধান কাণ্ডটিতে মাটি থেকে কমপক্ষে ১ মিটারের মধ্যে কোন ডাল রাখা চলবে না। এ ছাড়া শীতকালীন ফল সংগ্রহের পর মচকানো, মরা, রোগাক্রান্ত, পোকাক্রান্ত ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছাঁটাই করতে হবে।

ফল সংগ্রহ

পুষ্ট, রং উজ্জ্বল ও হালকা হলুদ হলেই ফল সংগ্রহ করতে হয়। গাছে ঝাকি দিয়ে ফল আহরণ করা যাবে না এবং আহরণ কালে ফল যাতে মাটিতে না পড়ে এবং কোনভাবে আঘাতপ্রাপ্ত না হয় সেদিকে সতর্ক নজর রাখতে হবে। বৃষ্টির পরপরই ফল সংগ্রহ করা ঠিক নয়। হাত দিয়ে বা জাল লাগানো কোটার সাহায্যে খুব সাবধানে ফল সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত ফল সরাসরি রোদে না রেখে ছায়ায় রাখতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা

এ্যানথ্রাকনোজ রোগ

এক প্রকার ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। পাতা, ফুল ও ফলে এ রোগ হতে পারে। প্রথমে ছোট ছোট বাদামী রঙের দাগের মাধ্যমে এ রোগের শুরু হয় এবং আস্তে আস্তে এ দাগগুলো বড় হয়ে কালো বর্ণ ধারণ করে এবং আক্রান্ত স্থান পচে যায়। আক্রান্ত পাতা, ফুল ও ফল ঝরে যেতে পারে।

এ্যানথ্রাকনোজ রোগাক্রান্ত পাতা

প্রতিকার

আক্রান্ত পাতা, ফুল ও ফল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। রোগের লক্ষণ দেখা দিলে ব্যাভিস্টিন অথবা নোইন ৫ ডব্লিউপি প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন অন্তর ২/৩ বার স্প্রে করতে হবে।

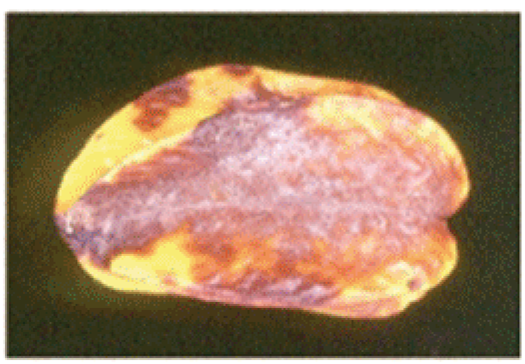

এ্যানথ্রাকনোজ রোগাক্রান্ত ফল

বাকল ও ডাল ছিদ্রকারী পোকা

কামরাঙ্গার ক্ষতিকর পোকাসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম। এ পোকা গাছের বাকল ও ডাল ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে। তাছাড়া কখনও কখনও এরা প্রশাখার কর্তিত অংশ দিয়েও ডালের ভিতর প্রবেশ করে। এ পোকার কীড়া রাতের বেলায় গাছের বাকল খেয়ে গাছের খাদ্য চলাচলে ব্যাঘাত ঘটায়। আক্রমণ বেশি হলে পুরো গাছটাই এক সময় শুকিয়ে মারা যায়। গাছে এ পোকার উপস্থিতি খুব সহজেই ডালের গায়ে ঝুলে থাকা কাঠের গুঁড়া-মিশ্রিত মলের ছোট ছোট দানা দ্বারা চিহ্নিত করা সম্ভব। দিনের বেলায় কীড়া গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকে এবং রাতের বেলা সচল হয়।

প্রতিকার

ডালের গায়ে ঝুলে থাকা কাঠের গুঁড়া মিশ্রিত মল পরিষ্কার করতে হবে ও কাণ্ডের ভিতরের পোকা বের করে মেরে ফেলতে হবে। ডালের গর্তের মধ্যে কেরোসিন বা পেট্রোল অথবা ন্যাপথোলিন প্রবেশ করিয়ে কাদা মাটি দ্বারা ছিদ্রের মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। মার্শাল-২০ ইসি অথবা রগর/রকসিয়ন-৪০ ইসি জাতীয় কীটনাশক ২ মিলি প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে গাছে এক সপ্তাহ পর পর ৩-৪ বার স্প্রে করতে হবে। পোকায় খাওয়া বাকল চেঁছে কপার জাতীয় ছত্রাকনাশকের প্রলেপ দিতে হবে।

ফল ছিদ্রকারী পোকা

টক জাতের কামরাঙ্গায় এ পোকার আক্রমণ কম হলেও 'বারি কামরাঙ্গা-১', 'বারি কামরাঙ্গা-২' ও অন্যান্য মিষ্টি জাতে মাঝে মাঝে ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা যায়। এ পোকা ফলের গায়ে ডিম পাড়ে এবং ডিম থেকে উৎপন্ন শুককীট ফলের শাঁস খেয়ে ভিতরে ঢুকে। এতে ফল খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে যায়।

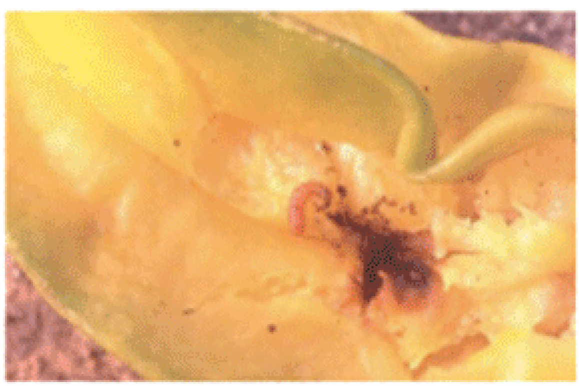

ফল ছিদ্রকারী পোকা আক্রান্ত ফল

প্রতিকার

আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে কীড়াসহ মাটির গভীরে পুঁতে ফেলতে হবে। বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। আলোক ফাঁদ ব্যবহার করেও এদের দমন করা যায়। ফল ধরার পর সুমিথিয়ন/লেবাসিড ২ মিলি হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

অনিষ্টকারী মেরুদণ্ডী প্রাণী

টিয়া পাখি কামরাঙ্গার প্রধান শত্রু। এরা যতটুকু ফল খায় তার চেয়ে অনেক বেশি নষ্ট করে। ফল সামান্য বড় হওয়ার পর থেকেই টিয়া পাখির আক্রমণ শুরু হয়।

প্রতিকার

গাছকে জাল দ্বারা ঢেকে অথবা টিন পিটিয়ে শব্দ সৃষ্টির মাধ্যমে টিয়া পাখির আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করতে হবে।

তৈকর

তৈকর দেশের একটি আদি ফল। বাংলাদেশের সিলেট জেলায় তৈকরের চাষ হয় এবং এ অঞ্চলে ফলটির যথেষ্ট চাহিদাও রয়েছে। বাংলাদেশের অন্যান্য জেলায়ও এ ফলের চাষ সম্ভব।

ফল উপ-বৃত্তাকার ও বড়। কাঁচা ও পাকা ফলের রং যথাক্রমে সবুজ এবং হলুদ। তৈকরের ঔষধী গুণাগুণ রয়েছে।

তৈকর সিলেট জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বহু বছর যাবত উৎপাদিত হয়ে আসছে। এটি একটি অপ্রধান টক জাতীয় ফল যা তরকারীতে এবং আচার, জ্যাম, জেলী তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

ফলসহ তৈকর গাছ

তৈকরের জাত

বারি তৈকর-১

'বারি তৈকর-১' জাতটি ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। তৈকর গাছ বছরে ২ বার ফল দেয়। গাছ পিরামিড আকৃতির, বড় এবং গাছে সারা বছর বড় বড় সবুজ পাতা থাকে। প্রথমবার ফুল আসে মধ্য-শ্রাবণ থেকে মধ্য-আশ্বিন (আগস্ট-সেপ্টেম্বর) মাসে এবং দ্বিতীয়বার ফুল আসে মধ্য-মাঘ থেকে মধ্য-ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি) মাসে। প্রথমবার ফল সংগ্রহের উপযোগী হয় মধ্য-কার্তিক থেকে মধ্য-পৌষ (নভেম্বর-ডিসেম্বর) মাসে

এবং দ্বিতীয়বার ফল সংগ্রহের উপযোগী হয় মধ্য-চৈত্র থেকে মধ্য জ্যৈষ্ঠ (এপ্রিল-মে) মাসে। ফল চেপ্টা-গোলাকৃতির, আকারে বড় (৭০০-৭৫০ গ্রাম)। প্রতিটি ফলের দৈর্ঘ্য ১০.৩ সেমি এবং প্রস্থ ৯.২ সেমি। কচি ফলের রং সবুজ, পাকা ফলের রং হলুদ। ফলপ্রতি বীজের সংখ্যা ৪-৭টি।

ফলের স্বাদ যথেষ্ট টক। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৩০০-৩৫০টি। হেক্টরপ্রতি ফলন ৭০-৭৫ টন। বৃহত্তর সিলেট জেলায় চাষের জন্য উপযোগী। জাতটি রপ্তানিযোগ্য।

বারি তৈকর-১

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি

বেলে দোআঁশ থেকে পলি দোআঁশ মাটি তৈকর চাষের জন্য উত্তম। সিলেটের পাহাড়ি অঞ্চলের নিকাশযুক্ত অম্লীয় মাটি তৈকর উৎপাদনের জন্য সর্বোত্তম।

গর্ত তৈরি

চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ৬ × ৬ মিটার দূরত্বে ১ × ১ × ১ মিটার আকারের গর্ত করতে হবে। গর্তের উপরের মাটির সাথে ১৫-২০ কেজি জৈব সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি ও ১০০ গ্রাম জিপসাম সার ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে তাতে পানি দিতে হবে। হেক্টরপ্রতি ২৭৮টি চারা বা গুটির প্রয়োজন হবে।

চারা রোপণ

গর্ত তৈরির কমপক্ষে ১৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে। চারাটি গর্তে সোজা করে লাগাতে হবে। লাগানোর পর ঝর্ণা দিয়ে পানি সেচ, খুঁটি ও বেড়া দিতে হবে।

সার প্রয়োগ

গাছের যথাযথ বৃদ্ধির জন্য সময়মত, সঠিক পরিমাণে এবং সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। বয়সভেদে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হলঃ

গাছের বয়স (বছর)	গোবর সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
১-২	৫-১০	২০০-৩০০	২০০-৩০০	২০০-৩০০
৩-৪	১০-১৫	৩০০-৪৫০	৩০০-৪৫০	৩০০-৪৫০
৫-১০	২০-২৫	৪৫০-৬০০	৪৫০-৬০০	৪৫০-৬০০
১০-১৫	২৫-৩০	৬০০-৭৫০	৬০০-৭৫০	৬০০-৭৫০
১৫ এর অধিক	৩০-৪০	১০০০	১০০০	১০০০

উল্লিখিত সার প্রতিবছর সমান তিন কিস্তিতে বর্ষার আগে ও বর্ষার পরে এবং শীতের পরে গাছে প্রয়োগ করতে হবে। গাছের ডালপালা যে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে তার নিচের জমি কোদাল দিয়ে হালকা করে কুপিয়ে সার প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণত গাছের গোড়ার এক মিটার এলাকায় কোন সক্রিয় শিকড় থাকে না, তাই সার প্রয়োগের সময় এই পরিমাণ সার প্রয়োগ করা উচিত নয়। পাহাড়ী অঞ্চলে ডিবলিং পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করা হলে ভূমি ক্ষয় হ্রাস পাবে।

সেচ প্রয়োগ

শুকনা মৌসুমে ১৫ দিন অন্তর পানি সেচ দেয়া উত্তম। পাহাড়ী অঞ্চলে বর্ষার শেষে মালচিং করা যেতে পারে। এতে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। মনে রাখতে হবে, সার প্রয়োগের পর পানি সেচ অত্যন্ত জরুরি । জমিতে 'জো' না থাকলে ফুল আসার পর ও ফল মটর দানার সময় গাছে অবশ্যই পানি সেচ দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ

বছরে সাধারণত ২ বার ফল সংগ্রহ করা হয়। পরিপক্ক অবস্থায় ফলের রং হলদে হয়।

লটকন

লটকন বাংলাদেশের একটি সুপরিচিত অপ্রধান ফল। প্রধান কাণ্ড ও ডালপালা থেকে সরাসরি ফুলের মঞ্জরী বের হয়। ছড়া জাতীয় মঞ্জরীতে এক লিঙ্গিক ফুল উৎপন্ন হয় অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ গাছ আলাদা। নরসিংদী, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নেত্রকোণা ও সিলেট এলাকায় উল্লেখযোগ্যভাবে এর চাষাবাদ হয়। বিভিন্ন দেশে সীমিত আকারে লটকন রপ্তানি হচ্ছে।

ফলসহ লটকন গাছ

লটকনের জাত

বারি লটকন-১

লটকন বাংলাদেশে অম্ল মধুর স্বাদযুক্ত একটি সুপরিচিত ফল। স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০০৮ সালে 'বারি লটকন-১' জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৮ টন।

ফল গোলাকৃতির, রং হালকা হলুদ থেকে বাদামী বর্ণের, শাঁস নরম, রসালো ও সুগন্ধযুক্ত। ফলের গড় ওজন ১৫ গ্রাম। এতে ৪-৫টি কোষ থাকে। জাতটি বাংলাদেশের সব এলাকায় চাষোপযোগী।

বারি লটকন-১

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি

সুনিষ্কাশিত প্রায় সব ধরনের মাটিতেই লটকনের চাষ করা যায়। তবে বেলে দোআঁশ মাটি লটকন চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। লটকন গাছ স্যাঁত স্যাঁতে ও আংশিক ছায়াযুক্ত পরিবেশে ভাল জন্মে কিন্তু জলাবধদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

জমি তৈরি

চাষ ও মই দিয়ে জমি সমতল এবং আগাছামুক্ত করে নিতে হবে।

গর্ত তৈরি

বর্ষার প্রারম্ভে চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ৭ × ৭ মিটার দূরত্বে ১ × ১ × ১ মিটার আকারের গর্ত করতে হবে। প্রতি গর্তে ১৫-২০ কেজি জৈব সার, ৫০০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। মাটি শুকনা হলে গর্তে পানি দিয়ে মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে। এভাবে ১০-১৫ দিন গর্ত ভরাট করে রেখে দিতে হবে। তারপর ভালভাবে আবার কুপিয়ে চারা/কলম লাগাতে হবে।

চারা রোপণ

গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারা গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগাতে হবে। চারা লাগানোর পরপরই পানি ও খুঁটি দিতে হবে। প্রয়োজনে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

রোপণের সময়

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ (এপ্রিল-মে) মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে বর্ষার শেষের দিকে অর্থাৎ ভাদ্র-আশ্বিন (সেপ্টেম্বর) মাসেও গাছ রোপণ করা যেতে পারে।

সার প্রয়োগ

প্রত্যাশিত ফলন ও গুণগত মানসম্পন্ন ফল পেতে হলে লটকন গাছে নিয়মিত সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বিভিন্ন বয়সের গাছের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নিচের ছকে দেয়া হলঃ

সারের নাম	গাছের বয়স (বছর)			
	১-৪	৫-১০	১১-১৫	১৫ এর উর্ধ্বে
গোবর (কেজি)	১০	২০	৩০	৩০-৪০
ইউরিয়া (গ্রাম)	৩০০	৫০০	৮০০	১০০০
টি এস পি (গ্রাম)	২০০	৩০০	৪০০	৫০০
এমওপি (গ্রাম)	২০০	৩০০	৪০০	৫০০
জিপসাম (গ্রাম)	১০০	২০০	২৫০	৩০০

গাছের গোড়ার ০.৫-১.০ মিটার দূর থেকে যতটুকু জায়গায় দুপুর বেলা ছায়া পড়ে ততটুকু জায়গায় সার ছিটিয়ে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে অথবা চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। মাটিতে রস কম থাকলে সার প্রয়োগের পরপরই পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। উল্লিখিত সার সমান তিন কিস্তিতে (১ম কিস্তি ফল সংগ্রহের পরপর, ২য় কিস্তি বর্ষার শেষে এবং ৩য় কিস্তি শীতের শেষে) প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সেচ প্রয়োগ

চারা রোপণের প্রথমদিকে ঘন ঘন সেচ দেয়া দরকার। ফল ধরার পর শুকনো মৌসুমে শীতের শেষে গাছে ফুল আসার পর ২/১টি সেচ দিতে পারলে ফলের আকার বড় হয় ও ফলন বাড়ে।

ডাল ছাঁটাই

গাছের মরা ডাল এবং রোগ ও পোকা আক্রান্ত ডাল ছাঁটাই করে দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ

শীতের শেষে গাছে ফুল আসে এবং জুলাই-আগস্ট মাসে ফল পাকে। ফলের রং হালকা হলুদ থেকে ধূসর বর্ণ ধারণ করলে ফল সংগ্রহের উপযুক্ত সময়।

ফলন

কলমের গাছে সাধারণত ৪ বৎসর বয়স থেকে ফল আসা শুরু হয় এবং সাধারণত ২০-২৫ বছরের গাছে সর্বোচ্চ ফলন হয়ে থাকে। অবস্থাভেদে গাছের বয়সের উপর ভিত্তি করে গাছপ্রতি ৪ কেজি থেকে ১২০/১৩০ কেজি পর্যন্ত ফলন হয়ে থাকে।

অন্যান্য পরিচর্যা

ফল ছিদ্রকারী পোকা

ফল ছোট অবস্থায় যখন ফলের খোসা নরম থাকে তখন এই পোকা ফলের খোসা ছিদ্র করে ডিম পাড়ে। পরবর্তীকালে ডিম থেকে লার্ভা উৎপন্ন হয় এবং ফল পাকলে ফলের নরম শাঁস খেয়ে থাকে।

পোকা আক্রান্ত ফল

প্রতিকার

- আক্রান্ত ফল পোকাসহ নষ্ট করে ফেলতে হবে।
- প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে পারফেকথিয়ন বা লেবাসিড ৫০ ইসি মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার ফল ছোট থাকা অবস্থায় গাছে স্প্রে করতে হবে।

চেফার বিটল

এই পোকা পাতার নিচে ডিম পাড়ে এবং ডিম থেকে লাভা উৎপন্ন হওয়ার পর লাভা পাতা খেয়ে ছিদ্র করে ফেলে এবং আস্তে আস্তে সমস্ত পাতা খেয়ে জালেরমত করে ফেলে।

চেফার বিটল

প্রতিকার

সুমিথিয়ন/ডেবিকুইন ৪০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

স্কেল পোকা

এই পোকা প্রথমে পাতার নিচে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বাচ্চা বের হলে এরা পাতার রস শোষণ করে খেতে থাকে। আস্তে আস্তে এরা কচি ডালেও আক্রমণ করে অবশেষে সমস্ত গাছকে মেরে ফেলে।

প্রতিকার

এই পোকার আক্রমণ দেখা যাওয়া মাত্র ব্রাশ দিয়ে ঘষে মেরে ফেলতে হবে অথবা সাবানের পানি দিয়ে স্প্রে করলেও প্রাথমিকভাবে দমন করা যায়। আক্রমণ বেশি হল টেসার/০.২ এমএল/লিটার) অথবা ফিপ্রোনিল (১ এমএল/লিটার) অথবা একতারা (০.৫ গ্রাম/লিটার) হারে স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

এ্যানথ্রাকনোজ

কলেটোট্রিকাম সিডি নামক ছত্রাক লটকনের এ্যানথ্রাকনোজ রোগের কারণ। গাছের পাতা, কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা ও ফল এ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। ফলের গায়ে ছোট ছোট কাল দাগ এ রোগের প্রধান লক্ষণ । ফল শক্ত, ছোট ও বিকৃত আকারের হতে পারে। ফল পাকা শুরু হলে দাগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে থাকে এবং ফলটি ফেটে বা পচে যেতে পারে।

প্রতিকার

- গাছের নিচে ঝরে পড়া পাতা ও ফল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- গাছে ফল ধরার পর টপসিন- এম অথবা নোইন প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অথবা টিল্ট-২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়।

হঠাৎ করে গাছ মারা যাওয়া (উইল্ট)

ফিউজেরিয়াম নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ সমস্যা হয়। প্রথমে পাতা হলুদ হয়ে আসে এবং পরে শুকিয়ে যায়। এভাবে পাতার পর শাখা-প্রশাখা এবং ধীরে ধীরে সমস্ত গাছ ৮-১০ দিনের মধ্যে নেতিয়ে পড়ে ও মারা যায়।

প্রতিকার

এ রোগের কোন প্রতিকার নেই। তবে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো নেয়া হলে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

- দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- রোগের প্রাথমিক অবস্থায় বর্দোমিক্সার অথবা কুপ্রাভিট অথবা কপার অক্সিক্লোরাইড প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।
- বাগানের মাটির অম্লত্ব কমানোর জন্য জমিতে চুন প্রয়োগ করতে হবে (২৫০-৫০০ গ্রাম/গাছ)।
- রোগ প্রতিরোধী আদিজোড়ের উপর কলম করতে হবে।

আমলকি

আমলকি একটি অবহেলিত কিন্তু মূল্যবান ফল। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও সিলেট এলাকায় আমলকির চাষ বেশি হয়। আমলকি ভিটামিন 'সি' ও 'ক্যালসিয়াম' সমৃদ্ধ ফল। এ ফলে যে পরিমাণ ভিটামিন 'সি' আছে দেশের অন্য কোন ফলে তা নেই। জনসাধারণের ভিটামিন 'সি' এর ঘাটতি বিবেচনা করে এ ফলের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া উচিত। দেশের প্রতিটি বসতবাড়িতে একটি আমলকি গাছ থাকা আবশ্যক।

আমলকি চাষাবাদের মাধ্যমে দৈনন্দিন ভিটামিন 'সি' এর চাহিদা মেটানো সম্ভব। তাই এ ফলের বাণিজ্যিক চাষের গুরুত্ব রয়েছে।

আমলকি

মাটি ও জলবায়ু

আমলকি গ্রীষ্ম ও অব-গ্রীষ্ম মণ্ডলীয় অঞ্চলের ফল। এর জন্য নাতি দীর্ঘ ঠাণ্ডা, শুষ্ক তুষারপাতমুক্ত শীতকাল, উচ্চ বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতা বিশিষ্ট দীর্ঘ উষ্ণ শীতকাল প্রয়োজন। আমলকি একটি কষ্ট সহিষ্ণু উদ্ভিদ। জলবায়ু কিছুটা শুষ্ক হলেও গাছের কোন ক্ষতি হয়না। সুনিষ্কাশিত সব ধরনের মাটিতেই আমলকির চাষ করা যায়। তবে চুন সমৃদ্ধ দোআঁশ মাটিতে আমলকি ভাল হয়।

পুষ্টিমান ও ঔষধি গুণ

আমলকির ফল টাটকা অবস্থাতেই খাওয়া হয়। আমলকির রস যকৃত, পেটের পীড়া, হাঁপানি, কাশি, বহুমুত্র, অজীর্ণ ও জ্বর রোগে বিশেষ উপকারী। পাতার রস আমাশয় প্রতিষেধক ও বল বর্ধক। আমলকি রসের শরবত জন্ডিস, বদহজম ও কাশির জন্য উপকারী। ইউনানী শাস্ত্রে ঔষধ তৈরিতে আমলকির ব্যবহার প্রচলিত আছে। খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম আমলকিতে রয়েছে (জলীয় অংশ ৯১.৪%), খনিজ ০.৭ গ্রাম, আঁশ ৩.৪ গ্রাম, আমিষ ০.৯ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, শর্করা ৩.৫ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৩৪ মিলিগ্রাম, লৌহ ১.২ মিলিগ্রাম, ভিটামিন 'বি-১' ০.০২ মিলিগ্রাম, ভিটামিন 'বি-২' ০.০৮ মিলিগ্রাম, ভিটামিন 'সি' ৪৬৩ মিলিগ্রাম এবং খাদ্যশক্তি ১৯ কিলো-ক্যালরি।

আমলকির জাত

বারি আমলকি-১

উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। গাছ বড়, খাড়া ও অল্প ঝোপালো। পৌষ ও বৈশাখ মাসে গাছে ফুল আসে এবং জ্যৈষ্ঠ ও অগ্রহায়ণ মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল বড় (৩০ গ্রাম), চেপ্টা, ও হালকা সবুজ।

শাঁস সাদা, মধ্যম রসালো, কচকচে, অল্প কষ্টিভাব সম্বলিত এবং সুস্বাদু (ব্রিক্সমান ১২.০)। উচ্চ ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ। ভক্ষণযোগ্য অংশ ৯২%। হেক্টরপ্রতি ফলন ২৬.৪ টন। সমগ্র দেশে চাষোপযোগী।

বারি আমলকি-১

বংশ বিস্তার

যৌন ও অযৌন উভয় পদ্ধতিতেই আমলকির বংশ বিস্তার করা যায়। বীজ থেকে উৎপাদিত চারায় মাতৃ গাছের গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থাকে না এবং গাছের বৃদ্ধি ধীর গতি সম্পন্ন হয়। এজন্য কলমের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা ভাল। কলমের গাছে দ্রুত ফল ধরে। কলম করার জন্য আমলকির বীজ থেকে উৎপাদিত চারা আদি-জোড় এবং উন্নতমানের গাছের শাখা উপ-জোড় হিসেবে ব্যাবহার করা হয়। ফেব্রুয়ারি, মে-জুন এবং অক্টোবর মাসে ১৩ থেকে ১৪ মাস বয়সের চারার সাথে এক থেকে দেড় মাস

বয়স্ক আমলকির ডাল ফাটল কলম পদ্ধতিতে জোড়া লাগাতে হবে। কলম করার পর উপ-জোড়ের শুকিয়ে যাওয়া রোধ করার জন্য পলিথিন কাগজের ঢাকনা দিতে হবে। কলম টিকে গেলে ঢাকনা খুলে দিতে হবে। কলমটি নার্সারিতে স্থাপনের পর পানি সেচ, আগাছা দমন, সার প্রয়োগ এবং জোড়স্থানের নিচ থেকে গজানো কুঁশি ভাঙ্গাসহ অন্যান্য পরিচর্যা সঠিকভাবে করতে হবে। এভাবে উৎপাদিত রোগমুক্ত ১.০-১.৫ বছর বয়সী কলমের চারাকে রোপণের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি তৈরি

আমলকির জন্য সুনিষ্কাশিত এবং মাঝারী বা উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। বাগান আকারে চাষ করতে হলে নির্বাচিত জমি ভাল করে চাষ ও মই দিয়ে সমতল এবং আগাছামুক্ত করতে হবে।

রোপণের সময়

বর্ষার শুরুতে অর্থাৎ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস গাছ রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে বর্ষার শেষে অর্থাৎ ভাদ্র-আশ্বিন মাসে গাছ লাগানো যায়। অতিরিক্ত বর্ষায় চারা রোপণ না করাই ভাল।

গর্ত তৈরি

চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ৭ × ৭ মিটার দূরত্বে ১ × ১ × ১ মিটার আকারের গর্ত করতে হবে। গর্তের উপরের মাটির সাথে ১০-১৫ কেজি জৈব সার, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি ও ২০০ গ্রাম জিপসাম সার ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে তাতে পানি দিতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি ও চারা রোপণ

সমতল ভূমিতে বর্গাকার বা আয়তকার কিংবা ত্রিভুজাকার প্রণালীতে আমলকির চারা লাগানো যেতে পারে। কিন্তু উঁচু নিচু পাহাড়ী এলাকায় কন্টুর রোপণ প্রণালী অবলম্বন করতে হবে। গর্ত ভর্তি করার ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে নির্বাচিত চারাটা

সোজাভাবে লাগিয়ে তারপর চারদিকে মাটি দিয়ে চেপে দিতে হবে এবং লাগানোর পর পরই বাঁশের খুঁটি, বেড়া ও পানি সেচ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ

আমলকি গাছে আশানুরূপ গুণগত মানসম্পন্ন ফল পেতে চাইলে নিয়মিত সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বাড়ার সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। নিম্নের ছকে বয়স ভিত্তিক সারের পরিমাণ দেয়া হল:

গাছের বয়স	জৈব সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)	জিপসাম (গ্রাম)
১-২ বছর	৫-১০	২০০	১০০	১০০	৫০
৩-৫ বছর	১০-১৫	৩০০-৫০০	২০০-৩০০	২০০-৩০০	১০০
৬-১০ বছর	১৫-২০	৪০০-৭০০	৩০০-৫০০	৩০০-৫০০	২০০
১১-১৫ বছর	২০-২৫	৮০০-১০০০	৫০০-৮০০	৫০০-৮০০	৪০০
১৫ বছর এর উর্ধ্বে	৩০-৪০	১৫০০	১০০০	১০০০	৫০০

উল্লিখিত সার সমান দুই ভাগ করে বর্ষার প্রারম্ভে ও শেষে গাছের গোড়া থেকে কিছুটা দূরে যতটুকু জায়গায় দুপুর বেলা ছায়া পড়ে ততটুকু জায়গায় ছিটিয়ে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে বা চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগের পরে প্রয়োজনে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

আগাছা দমন

আমলকি বাগান সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। গাছের তলায় বা চারিদিকে যাতে আগাছা জন্মাতে না পারে সেজন্য বর্ষার শুরুতে এবং শেষে জমিতে চাষ দিতে হবে অথবা কোদাল দ্বারা কুপিয়ে দিতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

চারা রোপণের প্রথমদিকে প্রয়োজনমত সেচ দেয়া দরকার। এছাড়া খরা বা শুকনো মৌসুমে পানি সেচ দেয়া ভাল।

ডাল ছাঁটাইকরণ

চারা বা কলম রোপণের পর গাছকে সুন্দর একটি কাঠামো দেয়ার জন্য গোড়ার দিকের সমস্ত ডালপালা ছাঁটাই করে দিতে হবে। এছাড়া বর্ষার শেষে গাছের মরা, রোগাক্রান্ত, ভাঙ্গা ও দুর্বল ডাল পালা ছাঁটাই করতে হবে।

ফল সংগ্রহ

ডালপালায় ঝাকুনি দিয়ে ফল মাটিতে ফেললে ফল আঘাত প্রাপ্ত হয়ে দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। তবে গাছের নিচে জাল ধরে শাখায় ঝাকুনি দিয়েও ফল সংগ্রহ করা যায়। সমস্ত ফল একসাথে পরিপক্ক হয় না। তাই ২/১ দিন পরপর ফল সংগ্রহ করতে হয়। সংগ্রহের সাথে সাথেই ফল বাজারজাত করতে হবে, কেননা সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে সংগৃহীত ফলে ভিটামিন 'সি' এর পরিমাণ কমতে থাকে।

অন্যান্য পরিচর্যা

মরিচা রোগ

এ রোগের আক্রমণে পাতা ও ফলে মরিচা দাগ পড়ে। এতে গাছের ফলন ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং ফলের গুণগতমান বিনষ্ট হয় ও বাজার মূল্য কমে যায়।

প্রতিকার

প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ইন্ডোফিল এম-৪৫ মিশিয়ে স্প্রে করলে এ রোগ দমন করা যায়।

আঁশফল

আঁশফল আমাদের দেশে একটি বিদেশি ফল। অনেকে একে কাঠ লিচুও বলে থাকে। ফল আকারে ছোট এবং খেতে সুস্বাদু। দেশের সর্বত্রই এর চাষ সম্ভব। আঁশফলে প্রচুর পরিমাণে শর্করা ও ভিটামিন 'সি' রয়েছে।

আঁশফল

আঁশফলের জাত

বারি আঁশফল-১

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৯৯৭ সালে 'বারি আঁশফল-১' জাতটি আমাদের দেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন করা হয়। এটি একটি বহু বর্ষজীবি বৃক্ষ।

উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। গাছ মাঝারী খাড়া প্রকৃতির ও মধ্যম ঝোপালো। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গাছে ফুল আসে এবং শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল ছোট (গড় ওজন ৩.৫ গ্রাম), গোলাকার, বাদামী রঙের, শাঁস সাদা, কচকচে এবং স্বাদ খুব মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২০-২৫%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৫৫-৬০%। বাংলাদেশের সব এলাকায় চাষ যোগ্য। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩-৪ টন।

ফুল আসে মধ্য-ফাল্গুন থেকে মধ্য-চৈত্র (মার্চ) মাসে এবং মধ্য-শ্রাবণ থেকে মধ্য-ভাদ্র (আগস্ট) মাসে ফল পাকে। জাতটি দেশের সর্বত্রই ভাল জন্মে।

বারি আঁশফল-১

বারি আঁশফল-২

আঁশফল লিচু পরিবারভুক্ত একটি ফল। স্বাদে, গন্ধে, পুষ্টিতে লিচুর সমতুল্য হওয়া সত্ত্বেও ফলটি এ দেশে তেমন জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে আঁশফল বেশ জনপ্রিয়। উন্নত গুণগত মানসম্পন্ন জাত না থাকায় ফলটি সর্বমহলে তেমন পরিচিত হয়ে ওঠেনি।

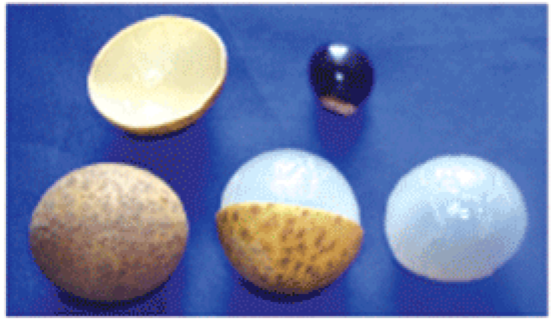

বারি আঁশফল-২ এর শাঁস

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ফল বিভাগ বারি আঁশফল-২ নামে আঁশফলের একটি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে। নিয়মিত ফলধারী জাতটি বিদেশ থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন করে ২০০৯ সালে মুক্তায়ন করা হয়। পাঁচ বছর বয়স্ক গাছে গড়ে ৪৩০টি ফল ধরে যার ওজন প্রায় চার কেজি। হেক্টরপ্রতি ফলন ৫ টন।

ফল গোলাকৃতির, বেশ বড় (৯ গ্রাম), শাঁস সাদা, আংশিক কচকচে, খুব রসালো, খুব মিষ্টি (টিএসএস ২৫%)। বীজ ছোট, খোসা পাতলা, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৭৩%। দেশের মধ্য, পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে চাষোপযোগী জাতটি ফলের আহরণ মৌসুম দীর্ঘায়িত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

বারি আঁশফল-২

উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন

আঁশফল চাষের জন্য দোআঁশ মাটি উত্তম।

চারা উৎপাদন

গ্রাফটিং ও গুটি কলমের মাধ্যমে চারা তৈরি করা যায়।

গর্ত তৈরি

চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ৫ × ৫ মিটার দূরত্বে ১ × ১ × ১ মিটার আকারের গর্ত করতে হবে। গর্তের উপরের মাটির সাথে ১৫-২০ কেজি জৈব সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমওপি সার ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে তাতে পানি দিতে হবে।

চারা রোপণ

বাগানে চারা রোপণের দূরত্ব ৫ × ৫ মিটার রাখতে হবে। এ হিসেবে হেক্টরপ্রতি চারা লাগবে ৪০০টি।

সারের পরিমাণ

গুণগত মানসম্পন্ন উচ্চ ফলন পেতে হলে আঁশফলে নিয়মিত সার প্রয়োগ অত্যন্ড় জরুরি। গাছের বয়স বাড়ার সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। নিম্নের ছকে গাছের বয়স ভিত্তিক সারের পরিমাণ দেয়া হল।

গাছের বয়স	জৈব সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)	জিপসাম (গ্রাম)
১-২ বছর	৫-১০	১৫০-২৫০	১৫০	১৫০	৫০
৩-৪ বছর	১০-১৫	৩০০-৪৫০	৩০০-৪৫০	৩০০-৪৫০	১০০
৫-৬ বছর	১৫-২০	৫০০-৬০০	৪৫০-৬০০	৪৫০-৬০০	২০০
৭-১০ বছর	২০-২৫	৭৫০-১০০০	৬০০-৭৫০	৬০০-৭৫০	৩০০
১১ বছর বা তদুর্ধ্ব	২৫-৩০	১০০০-১২০০	৭৫০-৯০০	৭৫০-৯০০	৪০০

উল্লিখিত সার তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম বার ফাল্গুন-চৈত্র মাসে মুকুল আসার সময় ২য় বার জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বীজের রং ধারণ পর্যায়ে এবং শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল সংগ্রহের পর ৩য় বার সার প্রয়োগ করতে হয়।

সেচ প্রয়োগ

খরার সময় পানি সেচের প্রয়োজন হয়। অতিবৃষ্টির সময় পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

রাম্বুতান

রাম্বুতান আকর্ষণীয়, অত্যন্ত সুস্বাদু ও রসালো ফল। সাদা, স্বচ্ছ, অম্লীয় মিষ্টি গন্ধযুক্ত শাঁস এ ফলের ভক্ষণীয় অংশ। গায়ে লাল ও নরম কাঁটা থাকার কারণে এদের লিচু থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম দেখায়। অনেক স্থানে রাম্বুতানকে চুলওয়ালা লিচুও বলা হয়। মালেশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াতেই এদের উৎপত্তিস্থল এবং দক্ষিণ চীন, ইন্দোচীন ও ফিলিপাইন পর্যন্ত এটি বিস্তৃত।

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহ (যেখানে শীতের প্রকপ তুলনামূলকভাবে কম) রাম্বুতান চাষের জন্য অধিক উপযোগী।

ফলসহ রাম্বুতান গাছ

পুষ্টিমান

রাম্বুতান 'শর্করা' ও ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ একটি ফল। আহার উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম ফলে (জলীয় অংশ ৮২.১%, প্রোটিন ০.৯%, ফ্যাট ০.১%, ০.০৩% আঁশ, ০.০৫% ম্যালিক এসিড, ০.৩১% সাইট্রিক এসিড), ২.৮ গ্রাম গ্লুকোজ, ৩.০ গ্রাম ফ্রুকটোজ, ৯.৯ গ্রাম সুক্রোজ, ২.৮ গ্রাম ফাইবার, ৭০ মিলি গ্রাম ভিটামিন সি, ১৫ মিলি গ্রাম ক্যালসিয়াম, ০.১-২.৫ মিলি গ্রাম লৌহ, ১৪০ মিলি গ্রাম পটাসিয়াম, ও ১০ মিলি গ্রাম ম্যাগনেশিয়াম পাওয়া যায়।

রাম্বুতানের জাত

বারি রাম্বুতান-১

বিদেশ হতে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত জাতটি ২০১০ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য 'বারি রাম্বুতান-১' নামে অনুমোদন করা হয়। নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ বড় ও অত্যধিক ঝোপালো। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গাছে ফুল আসে, চৈত্র-বৈশাখ মাসে ফল ধরে। শ্রাবণ মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়, ফল ডিম্বাকৃতির, আকারে বড় (৫০ গ্রাম)।

পাকা ফলের রং আকর্ষণীয় লালচে খয়েরি। ফলের গায়ের কাঁটা (স্পাইনলেট) বেশ লম্বা ও নরম। শাঁস পুরু, মাংসল, সাদা, নরম, রসালো সুগন্ধযুক্ত এবং মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৯%)। বীজ ছোট ও নরম, খাদ্যোপযোগী অংশ ৫৮%। বাংলাদেশের সর্বত্র চাষযোগ্য। হেক্টরপ্রতি ফলন ১০-১২ টন।

বারি রাম্বুতান-১

জলবায়ু ও মাটি

রাম্বুতান উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু পছন্দ করে। ইহা ২২-৩৫° সে. তাপমাত্রা ও ২০০০ থেকে ৩০০০ মিমি বার্ষিক বৃষ্টিপাত পছন্দ করে। এঁটেল দোআঁশ মাটি রাম্বুতান চাষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী। তবে উর্বর, সুনিষ্কাশিত পলিমাটি ও দোআঁশ মাটিতেও রাম্বুতান সাফল্যজনকভাবে চাষ করা যায়। সুনিষ্কাশিত উচ্চ জৈব পদার্থ সম্বলিত মাটিতে গাছের মূলের বৃদ্ধি ও বিকাশ ভাল হয়। মাটির অম্ল/ক্ষারত্ব (pH ৫.০-৬.৫) রাম্বুতানের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। রাম্বুতান স্বল্পমেয়াদী জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারলেও দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতায় গাছ মারা যায়।

বংশ বিস্তার

অঙ্গজ উপায়ে অথবা বীজের মাধ্যমে রাম্বুতানের বংশ বিস্তার হয়ে থাকলেও মাতৃ গুণাগুণ বজায় রাখার জন্য অঙ্গজ উপায়ে বংশ বিস্তার উত্তম। কুঁড়ি সংযোজন, বায়বীয় দাবা কলম ও সংযুক্ত দাবাকলম পদ্ধতিতে রাম্বুতানের বংশ বিস্তার করা হয়। ১-২ বৎসর বয়সী শাখা থেকে সুপ্ত কুঁড়ি সংগ্রহ করে ৮-১২ মাস বয়সের রুটস্টক সংযোজন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়া, সংযুক্ত দাবা কলম পদ্ধতিতে সফলতার হার বেশি এবং শ্রমসাধ্য। ১০০০-১৫০০ পিপিএম ঘনত্বের আইবিএ ব্যবহার করে বায়বীয় দাবা কলমের মাধ্যমেও সফলভাবে রাম্বুতানের বংশ বিস্তার করা যায়।

জমি তৈরি

রাম্বুতানের জন্য সুনিষ্কাশিত উঁচু ও মাঝারী উঁচু উর্বর জমি নির্বাচন করতে হবে। পর্যায়ক্রমিক কয়েকটি চাষ ও মই দিয়ে জমি সমান করে নিতে হবে। মাদা তৈরির পূর্বে জমি থেকে বহুবর্ষজীবী আগাছা বিশেষ করে উলুঘাস সমূলে অপসারণ করতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি

সমতল ভূমিতে বর্গাকার কিংবা ষড়ভূজাকার এবং পাহাড়ী জমিতে কন্টুর পদ্ধতিতে কলম রোপণ করতে হবে। চারা কলম রোপণের পর হালকা ও অস্থায়ী ছায়ার ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল।

রোপণের সময়

মধ্য-সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য-অক্টোবর চারা কলম রোপণের উপযুক্ত সময়।

মাদা তৈরি

উভয় দিকে ৮-১০ মিটার দূরত্বে ১ × ১ × ১ মিটার আকারের গর্ত করে উন্মুক্ত অবস্থায় রাখতে হবে। কলম রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে প্রতি গর্তে ২৫-৩০ কেজি পচা গোবর, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ৩০০ গ্রাম এমওপি, ২০০ গ্রাম জিপসাম ও ৫০ গ্রাম জিংক সালফেট সার গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে রেখে দিতে হবে। মাটিতে রসের অভাব থাকলে পানি সেচ দিতে হবে।

চারা রোপণ

গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারাটি সোজাভাবে গর্তের মাঝখানে লাগিয়ে চারার চারদিকের মাটি হাত দিয়ে চেপে ভালভাবে বসিয়ে দিতে হবে এবং খুঁটি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে যাতে বাতাসে চারার গোড়া নড়ে না যায়। রোপণের পরপরই পানি সেচ দিতে হবে। এরপর নিয়মিত পানি সেচ ও প্রয়োজনে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ

বয়স বাড়ার সাথে সাথে গাছের যথাযথ বৃদ্ধি ও কাঙ্ক্ষিত ফলনের জন্য সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। বিভিন্ন বয়সের গাছের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

গাছের বয়স	গাছপ্রতি সারের পরিমাণ			
	গোবর সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
১-২ বছর	১০-১৫	২০০	২৫০	১৫০
২-৪ বছর	১৫-২০	৩০০	৪৫০	৩০০
৫-৭ বছর	২০-২৫	৪৫০	৭৫০	৪৫০
৮-১০ বছর	২৫-৩০	৭৫০	১২০০	৬০০
১০-১৫ বছর	৩০-৪০	১২০০	১৫০০	৭৫০
১৫ বছরের উর্ধ্বে	৪০-৫০	১৫০০	২০০০	১০০০

উল্লিখিত সার সমান তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি ফল আহরণের পর (ভাদ্র মাসে), দ্বিতীয় কিস্তি শীতের প্রারম্ভে (কার্তিক মাসে) এবং শেষ কিস্তি গাছে ফল আসার পর (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে) প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে সার প্রয়োগের পর সেচ প্রদান করতে হবে।

আগাছা দমন

গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জমিকে আগাছামুক্ত রাখা প্রয়োজন। বর্ষার শুরুতে ও বর্ষার শেষে কোদাল দ্বারা কুপিয়ে বা চাষ দিয়ে আগাছা দমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন

রাম্বুতান গাছ খরা সংবেদনশীল। চারার বৃদ্ধির জন্য শুকনো মৌসুমে ১০-১৫ দিন পরপর সেচ দিতে হবে। ফলন্ত গাছের বেলায় সম্পূর্ণ ফুল ফোটা পর্যায়ে একবার, ফল মটর দানার মত হলে একবার এবং এর ১৫ দিন পর আরও একবার মোট তিনবার সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। সার প্রয়োগের পর সেচ দেয়া ভাল। বর্ষার সময় যাতে গাছের গোড়ায় পানি না জমে থাকে তার জন্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া ফুল আসার ৬-৮ সপ্তাহ আগে সামান্য পানির কষ্ট/পীড়ন দিলে আগাম ও অধিক ফুল ফুটতে দেখা যায়।

ডাল ও মুকুল ছাঁটাইকরণ

রাম্বুতান গাছকে সধারণত লম্বা ও খাড়াভাবে বাড়তে দেখা যায়। তাই প্রথম দিকেই গাছের সঠিকভাবে প্রুনিং করা জরুরি। ফল সংগ্রহের পরপর ফলের মুকুলগুলো গোড়া থেকে কেটে দিতে হবে তাতে গাছের নতুন কুঁড়িগুলো দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। মৃত, রোগাক্রান্ত এবং লকলকে ডালপালাগুলো নিয়মিত অপসারণ করতে হবে। কলমের চারার ক্ষেত্রে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য প্রথম ৩-৪ বছর পর্যন্ত মুকুল আসলে তা কেটে দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ

সাধারণত ফল ও স্পাইনলেটের রং লালচে বর্ণ ধারণ করলে ফল সংগ্রহ করতে হবে। অপরিপক্ক ফলে মিষ্টতা ও অন্যান্য গুণাবলী পরিপক্ক ফলের তুলনায় অনেক কম থাকে। ভাল বাজার মূল্য পাওয়ার জন্য ফল লালচে খয়েরী বর্ণ ধারণ করার ১০-১২ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করা ভাল। গাছে ফল অতিরিক্ত পাকিয়ে সংগ্রহ করলে এরিল শুকিয়ে শক্ত হয় এবং ফলের সুগন্ধ ও স্বাদ কমে যায়। রাম্বুতান নন ক্লাইমেক্টারিক ফল হওয়ায় সংগ্রহোত্তর ইথিলিন উৎপাদন ও শোষণের হার খুব বেশি থাকে। এই কারণে ফল খুব দ্রুত আর্দ্রতা হারায় এবং নষ্ট হতে থাকে।

অন্যান্য পরিচর্যা

ফল ছিদ্রকারী পোকা

ফলের বাড়ন্ত অবস্থায় পূর্ণ বয়স্ক পোকা ফলের বোঁটার কাছে খোসার নিচে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে ফলের ভিতরে ঢুকে বীজ খেতে থাকে। এতে অনেক অপরিপক্ক ও পরিপক্ক ফল ঝরে যায়। আক্রান্ত ফল খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে এবং ফলের বাজার মূল্য কমিয়ে দেয়।

দমন ব্যবস্থা

আক্রান্ত ফল কুড়িয়ে মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে এবং বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ডেসিস ২.৫ ইসি রিপকর্ড-১০ ইসি প্রতি লিটার পানির সাথে ১ মিলি হারে মিশিয়ে ফলের মার্বেল অবস্থা থেকে শুরু করে ১৫ দিন অন্তর ২-৩টি স্প্রে করতে হবে।

ছাতরা পোকা

গাছের শাখা-প্রশাখা ও পাতার নিচের দিকে এ পোকা একত্রে গাদা হয়ে থাকে। এ ছাড়া, ফলের গায়ে চুলের গোড়াতেও এদের আক্রমণ দেখা যায়। পূর্ণাঙ্গ পোকা ফল ও নিচের পাতা থেকে রস চুষে খেয়ে গাছকে দুর্বল করে ফেলে। এ পোকা দ্বারা নিঃসৃত পদার্থে স্যুটি মোল্ড ছত্রাক জন্মে যা পাতার সালোকসংশ্লেষণকে বাধাগ্রস্ত করে এবং গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে।

দমন ব্যবস্থা

আক্রমণের প্রথম দিকে পোকাসহ আক্রান্ত পাতা ধ্বংস করে ফেলতে হবে। প্রতি লিটার পানির সাথে ৫ গ্রাম সাবান মিশিয়ে ৭ দিন পর পর ২/৩ বার স্প্রে করতে হবে। আক্রমণ তীব্র হলে এডমায়ার ২০০ এসএল ০.৪ মিলি প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার স্প্রে করতে হবে।

পাউডারী মিলডিউ

এ রোগের আক্রমণে রাম্বুতানের মুকুলে সাদা বা ধূসর বর্ণের পাউডারের আবরণ দেখা যায়। আক্রান্ত মুকুল নষ্ট হয় ও ঝরে পড়ে।

দমন ব্যবস্থা

গাছে মুকুল আসার পর কিন্তু ফুল ফোঁটার আগে একবার এবং একমাস পর আরেকবার টিল্ট-২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি অথবা থিওভিট প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ড্যাম্পিং অফ

নার্সারিতে রাম্বুতানের বীজ থেকে চারা করার সময় এ রোগের আক্রমণ হয়ে থাকে। এ রোগের আক্রমণে চারা গোড়ার দিকে পচে যায় এবং চারা মারা যায়। বর্ষা মৌসুমে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়।

দমন ব্যবস্থা

বীজ বপনের আগে বীজতলা আধা পচা খৈল বা মুরগির বিষ্ঠা দিয়ে শোধন করতে হবে। বপনের পূর্বে এগ্রোসিন দ্বারা বীজ শোধন করতে হবে। বীজতলায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত সেচ দেয়া যাবে না এবং দ্রুত পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। রোগ দেখা মাত্র রিডোমিল গোল্ড ০.২% হারে প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

রাম্বুতান ফল

স্ট্রবেরি

স্ট্রবেরি একটি গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। মৃদু শীত প্রধান দেশে এটি স্বল্প মেয়াদী ফল হিসেবে চাষ হয়। আকর্ষণীয় রং, গন্ধ ও উচ্চ পুষ্টিমানের জন্য স্ট্রবেরি অত্যন্ত সমাদৃত।

এতে প্রচুর ভিটামিন 'সি' ছাড়াও পর্যাপ্ত পরিমাণে অন্যান্য ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ বিদ্যমান। ফল হিসেবে সরাসরি খাওয়া ছাড়াও বিভিন্ন খাদ্যের সৌন্দর্য ও সুগন্ধ বৃদ্ধিতেও স্ট্রবেরি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

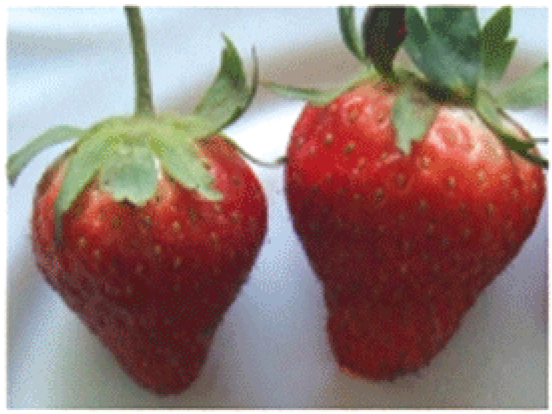

স্ট্রবেরি ফল

ফলসহ স্ট্রবেরি গাছ

স্ট্রবেরির জাত

বারি স্ট্রবেরি-১

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'বারি স্ট্রবেরি-১' নামে একটি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে। জাতটি ২০০৮ সালে অবমুক্ত করা হয়।

বাংলাদেশে সর্বত্র চাষোপযোগী একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছের গড় উচ্চতা ৩০ সেমি এবং বিস্তার ৪৫-৫০ সেমি। নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে গাছে ফুল আসতে শুরু করে এবং ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত ফল আহরণ করা যায়। গাছপ্রতি গড়ে ৩২টি ফল ধরে যার মোট গড় ওজন ৪৫০ গ্রাম। হেক্টরপ্রতি ফলন ১০-১২ টন। হৃৎপিন্ডাকৃতির ফল ক্ষুদ্র থেকে মধ্যম আকারের যার গড় ওজন ১৪ গ্রাম।

পাকা ফল আকর্ষণীয় টকটকে লাল বর্ণের। ফলের ত্বক নরম ও ঈষৎ খসখসে। ফলের শতভাগ ভক্ষণযোগ্য। স্ট্রবেরির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুগন্ধযুক্ত ফলের স্বাদ টক-মিষ্টি (টিএসএস-১২%)। জাতটি পর্যাপ্ত সরু লতা ও চারা উৎপাদন করে বিধায় এর বংশ বিস্তার সহজ।

বারি স্ট্রবেরি-১

স্ট্রবেরির উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও আবহাওয়া

স্ট্রবেরি মূলত মৃদু শীত প্রধান অঞ্চলের ফসল। কিন্তু গ্রীষ্মায়িত জাত কিছুটা তাপ সহিষ্ণু। দিন ও রাতে যথাক্রমে ২০-২৬° ও ১২-১৬° সে. তাপমাত্রা গ্রীষ্মায়িত জাতসমূহের জন্য প্রয়োজন। ফুল ও ফল আসার সময় শুষ্ক আবহাওয়া আবশ্যক। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় রবি মৌসুম স্ট্রবেরি চাষের উপযোগী। বৃষ্টির পানি জমে না এ ধরনের উর্বর দোআঁশ থেকে বেলে-দোআঁশ মাটি স্ট্রবেরি চাষের জন্য উত্তম।

চারা উৎপাদন

স্ট্রবেরি রানারের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে থাকে। তাই পূর্ববর্তী বছরের গাছ নষ্ট না করে জমি থেকে তুলে জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ হালকা ছায়াযুক্ত স্থানে রোপণ করতে হবে। উক্ত গাছ হতে উৎপন্ন রানারে যখন শিকড় বের হবে তখন তা কেটে ৫০ ভাগ গোবর ও ৫০ ভাগ পলিমাটিযুক্ত পলিথিন ব্যাগে লাগাতে হবে এবং হালকা ছায়াযুক্ত নার্সারিতে সংরক্ষণ করতে হবে। অতিরিক্ত বৃষ্টির হাত হতে চারাকে রক্ষার জন্য বৃষ্টির মৌসুমে চারার উপর পলিথিনের ছাউনি দিতে হবে। রানারের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা হলে স্ট্রবেরির ফলন ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। তাই জাতের ফলন ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত চারা ব্যবহার করা উত্তম।

জমি তৈরি ও চারা রোপণ

স্ট্রবেরি উৎপাদনের জন্য কয়েকবার চাষ ও মই দিয়ে উত্তমরূপে জমি তৈরি করতে হবে। চারা রোপণের জন্য বেড পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এ জন্য ১ মিটার প্রশস্ত এবং ১৫-২০ সেমি উঁচু বেড তৈরি করতে হবে। দুটি বেডের মাঝে ৪০-৫০ সেমি নালা রাখতে হবে। প্রতি বেডে ৫০-৬০ সেমি দূরত্বে দুই সারিতে ৩০-৪০ সেমি দূরে দূরে চারা রোপণ করতে হবে। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় আশ্বিন মাস (মধ্য-সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য-অক্টোবর) স্ট্রবেরির চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায়।

সার প্রয়োগ

গুণগত মানসম্পন্ন উচ্চফলন পেতে হলে স্ট্রবেরির জমিতে হেক্টরপ্রতি নিম্নলিখিত পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	হেক্টরপ্রতি পরিমাণ
পচা গোবর	৩০ (টন)
ইউরিয়া	২৫০ (কেজি)
টিএসপি	২০০ (কেজি)
এমওপি	২২০ (কেজি)
জিপসাম	১৫০ (কেজি)

শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম ও অর্ধেক পরিমাণ এমওপি সার জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া ও অবশিষ্ট এমওপি সার চারা রোপণের ১৫ দিন পর থেকে ১৫-২০ দিন অন্তর ৪-৫ কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ ও নিষ্কাশন

জমিতে রসের অভাব দেখা দিলে প্রয়োজনমত পানি সেচ দিতে হবে। স্ট্রবেরি জলাবদ্ধতা মোটেই সহ্য করতে পারে না। তাই বৃষ্টি বা সেচের অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

সরাসরি মাটির সংস্পর্শে এলে স্ট্রবেরির ফল পচে নষ্ট হয়ে যায়। এ জন্য চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর স্ট্রবেরির বেড খড় বা কাল পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। খড়ে যাতে উঁই পোকার আক্রমণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রতি লিটার পানির সাথে ৩ মিলি ডার্সবান-২০ ইসি ও ২ গ্রাম ব্যাভিস্টিন ডিএফ মিশিয়ে ঐ দ্রবণে খড় শোধন করে নিলে তাতে উঁই পোকার আক্রমণ হয় না এবং দীর্ঘ দিন তা অবিকৃত থাকে। জমি সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। গাছের গোড়া হতে নিয়মিতভাবে রানার বের হয়। উক্ত রানারসমূহ ১০/১৫ দিন পর পর কেটে ফেলতে হবে। রানার কেটে না ফেললে গাছের উৎপাদন হ্রাস পায়।

ফল সংগ্রহ

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি (অক্টোবরের শুরু) সময়ে রোপণকৃত বারি স্ট্রবেরি-১ এর ফল সংগ্রহ পৌষ মাসে শুরু হয়ে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত চলে। ফল পেকে লাল বর্ণ ধারণ করলে ফল সংগ্রহ করতে হয়। স্ট্রবেরির সংরক্ষণকাল খুবই কম বিধায় ফল সংগ্রহের পর পরই তা টিস্যু পেপার দিয়ে মুড়িয়ে প্লাস্টিকের ঝুড়ি বা ডিমের ট্রেতে এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে ফল গাদাগাদি অবস্থায় না থাকে। ফল সংগ্রহের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাজারজাত করতে হবে। স্ট্রবেরির সংরক্ষণ গুণ ও পরিবহন সহিষ্ণুতা কম হওয়ায় বড় বড় শহরের কাছাকাছি এর চাষ করা উত্তম।

হেক্টরপ্রতি ৩৫-৪০ হাজার চারা রোপণ করা যায়। প্রতি গাছে ২৫০-৩০০ গ্রাম হিসেবে বারি স্ট্রবেরি-১ এর ফলন হেক্টরপ্রতি ১০-১২ টন।

মাতৃ গাছ রক্ষণাবেক্ষণ

স্ট্রবেরি গাছ প্রখর সৌর-তাপ এবং ভারী বর্ষণ সহ্য করতে পারে না। এজন্য মার্চ-এপ্রিল মাসে হালকা ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে। নতুবা ফল আহরণের পর মাতৃ গাছ তুলে টবে রোপণ করে ছায়ায় রাখতে হবে। ফল আহরণ শেষ হওয়ার পর সুস্থ-সবল গাছ তুলে পলিথিন ছাউনির নিচে রোপণ করলে মাতৃ গাছকে খরতাপ ও ভারী বর্ষণের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা যায়। মাতৃ গাছ থেকে উৎপাদিত রানার পরবর্তী সময়ে চারা হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

স্ট্রবেরি বাগান

অন্যান্য পরিচর্যা

পাতায় দাগ পড়া রোগ

দাগ পড়া রোগে আক্রান্ত পাতা

কোন কোন সময় ছত্রাকজনিত রোগের পাতায় বাদামী রঙের দাগ পরিলক্ষিত হয়। এ রোগের আক্রমণ হলে ফলন এবং ফলের গুণগত মান হ্রাস পায়।

প্রতিকার

সিকিউর নামক ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করে সুফল পাওয়া যায়।

ফল পচা রোগ

এ রোগের আক্রমণে ফলের গায়ে জলে ভেজা বাদামী বা কালো দাগের সৃষ্টি হয়। দাগ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং ফল খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে যায়।

প্রতিকার

ফল পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে নোইন ৫০ ডব্লিওপি অথবা ব্যাভিস্টিন ডিএফ নামক ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৮-১০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

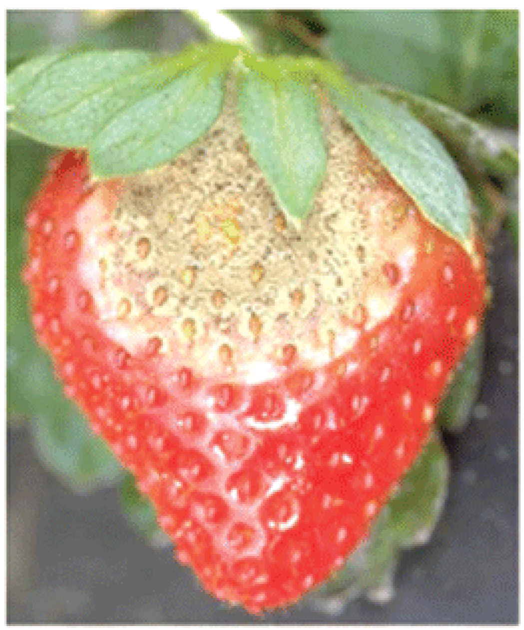

ফল পচা রোগে আক্রান্ত স্ট্রবেরি

ভারটিসিলাম উইল্ট রোগ

এ রোগে আক্রান্ত গাছ হঠাৎ করে দুর্বল ও বিবর্ণ হয়ে পড়ে। আক্রমণ বেশি হলে গাছ বাদামী বর্ণ ধারণ করে এবং মারা যায়। সাধারণত জলাবদ্ধতাসম্পন্ন জমিতে এ রোগের আক্রমণ বেশি হয়।

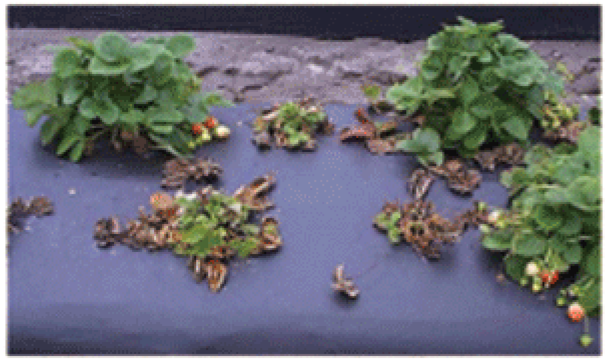

উইল্ট রোগে আক্রান্ত স্ট্রবেরি গাছ

প্রতিকার

জমি শুষ্ক রাখতে হবে। পলিথিন মাল্চ ব্যবহার করলে তা তুলে ফেলতে হবে। কপার জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন- বর্দোমিক্সার (১ঃ১ঃ১০) ৮-১০ দিন পরপর ২-৩ বার গাছের গোড়া ও মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

পাখি

বুলবুলি পাখি স্ট্রবেরির সবচেয়ে বড় শত্রু। ফল আসার পর সম্পূর্ণ পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই পাখির উপদ্রব শুরু হয়।

নেট দিয়ে ঘেরা স্ট্রবেরি বাগান

প্রতিকার

ফল আসার পর সম্পূর্ণ বেড জাল দ্বারা ঢেকে দিতে হবে যাতে পাখি ফল খেতে না পারে।

ভাইরাস

ভাইরাস রোগের আক্রমণে স্ট্রবেরির ফলন ক্ষমতা এবং গুণগত মান হ্রাস পেতে থাকে। সাদা মাছি এ ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

প্রতিকার

এডমায়ার ২০০ এসএল নামক কীটনাশক প্রতি লিটার পানির সাথে ০.২৫ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করে সাদা মাছি দমন করলে ভাইরাস রোগের বিস্তার রোধ করা যায়।

মাইট

মাইটের আক্রমণে স্ট্রবেরির ফলন ক্ষমতা ও গুণগত মান মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। এদের আক্রমণে পাতা তামাটে বর্ণ ধারণ করে ও পুরু হয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে কুচকে যায়। গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়।

প্রতিকার

ভারটিমেক ০১৮ ইসি নামক মাকড়নাশক প্রতি লিটার পানির সাথে ১ মিলি হারে মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

স্ট্রবেরির চারা গাছ

বিলাতি গাব

বিলাতি গাব একটি বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের সুন্দর ও সুস্বাদু ফলগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, পিরোজপুর এবং পাহাড়ী এলাকায় বিলাতী গাব গাছ দেখা যায়। বিলাতি গাবের গাছ মাঝারী থেকে উঁচু বৃক্ষ, ফল গোলাকার। বিলাতি গাব অনেকেই যত্ন সহকারে লাগিয়ে থাকেন। ফল হিসেবে দেশের সব এলাকায় এটি সমভাবে পরিচিত নয়। এর স্বাদ গন্ধ ও পুষ্টিমান সম্পর্কে সর্বমহলে ধারণার অভাব থাকায় সম্ভাবনাময় এ ফলটি তেমন বিস্তার লাভ করেনি।

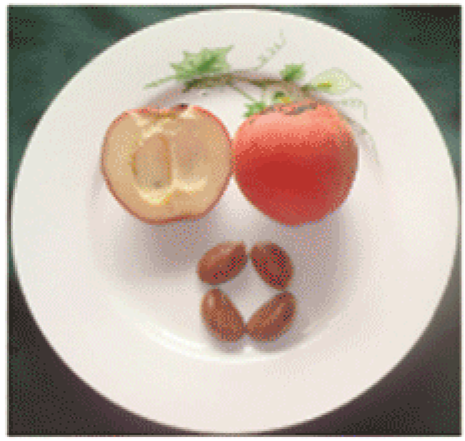

বিলাতি গাব

বিলাতি গাবের ত্বক রেশমী লোমে আবৃত, রং বাদামী থেকে উজ্জ্বল লাল। ফলের শাঁস সাদাটে, আঠালো ও সুস্বাদু। পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদা গাছে হয়।

বিলাতি গাব বাগান

বিলাতি গাবের জাত

বারি বিলাতি গাব-১

দেশীয় জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে দীর্ঘদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'বারি বিলাতি গাব-১' নামক জাতটি নির্বাচন করা হয়। সারা দেশে চাষাবাদের জন্য ২০১১ সালে জাতটি অনুমোদন করা হয়।

নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ খাড়া, চির সবুজ ও অত্যধিক ঝোপালো। মাঘ-ফাল্গুন মাসে গাছে ফুল আসে এবং শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়। গাছপ্রতি ৩৭২টি ফল ধরে যার ওজন ১২১ কেজি। ফল বড় (৩২৫ গ্রাম), গোলাকার ও আকর্ষণীয় উজ্জ্বল লাল বর্ণের। ফলের শাঁস ধূসর বর্ণের, আঠালো, সুগন্ধযুক্ত এবং মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৫%)। ফলপ্রতি ৩-৪টি বীজ থাকে, বীজ ছোট, খোসা পাতলা, খাদ্যোপযোগী অংশ ৭২%। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩০-৩৫ টন। দেশের সব এলাকায় চাষযোগ্য।

বারি বিলাতি গাব-১

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি

গ্রীষ্ম ও অব-গ্রীষ্ম মণ্ডলের উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া বিলাতি গাব চাষের জন্য উপযোগী। প্রায় সব ধরনের মাটিতে বিলাতি গাব গাছ সহজেই হতে পারে, তবে উর্বর মাটিতে বিলাতি গাব ভাল হয়। অনুর্বর মাটিতেও বিলাতি গাব ভাল ফলন দিতে সক্ষম। বিলাতি গাব গাছ অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু এবং অনেকটা বিনা যত্নেই ভাল ফলন দিয়ে থাকে। এরা যেমন খরা সহ্য করতে পারে তেমনি গোড়ায় দীর্ঘদিন পানি জমে থাকলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

বংশ বিস্তার

বীজের মাধ্যমে সাধারণত বিলাতি গাবের বংশ বিস্তার করা হয়ে থাকে। বীজাবরণ বেশ শক্ত বিধায় পরিপক্ক ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করে ২৪-৩০ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে নিলে অঙ্কুরোদগম ত্বরান্বিত হয়। বীজ দ্বারা বংশ বিস্তার করা হলে মাতৃ গাছের গুণাগুণ অক্ষুণ্ণ থকে না বিধায় অযৌন পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করা উত্তম। অঙ্গজ উপায়ে গুটি কলম এবং এক বছর বয়স্ক বিলাতি গাবের চারার উপর ভিনিয়ার/ক্লেফট পদ্ধতিতে সহজেই বিলাতি গাবের কলম করা যায়। বৈশাখ থেকে আষাঢ় মাস কলম করার উপযুক্ত সময়।

রোপণ পদ্ধতি

সমতল ভূমিতে বর্গাকার বা ষড়ভূজ প্রণালীতে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু উঁচু নিচু পাহাড়ে কন্টুর রোপণ প্রণালী অনুসরণ করতে হবে। মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বিলাতি গাবের চারা রোপণ করা যায়।

মাদা তৈরি

চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে উভয় দিকে ৬.০ মিটার দুরত্বে ১ × ১ × ১ মিটার মাপের গর্ত করতে হবে। প্রতি গর্তে ১৫-২০ কেজি কম্পোস্ট বা পচা গোবর, ৩-৫ কেজি ছাই, ২০০ গ্রাম টিএসপি এবং ২৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করে গর্তের উপরের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি

এক বছর বয়সী সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত চারা/কলম রোপণের জন্য নির্বাচন করতে হবে। গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারা/কলমটি গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগিয়ে তারপর চারদিকে মাটি দিয়ে চারার গোড়ায় মাটি সামান্য চেপে দিতে হবে। রোপণের পরপর খুঁটি দিয়ে চারা/কলমটি খুটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। অতঃপর প্রয়োজনমত পানি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ

প্রতিটি গাছের জন্য সারের পরিমাণ নিম্নরূপ হবেঃ

সার	গাছের বয়স			
	১-৩ বছর	৪-৭ বছর	৮-১০ বছর	১০ বছর এর উর্দ্ধে
গোবর/কম্পোস্ট সার (কেজি)	১০-১৫	১৫-২০	২০-২৫	২৫-৩০
ইউরিয়া (গ্রাম)	২০০-৩০০	৩০০-৪৫০	৫০০-৮০০	১০০০
টিএসপি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২০০-৩০০	৩০০-৪০০	৫০০
এমওপি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২০০-৩০০	৩০০-৪০০	৫০০

সবটুকু সার তিন ভাগ করে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র-আশ্বিন ও মাঘ-ফাল্গুন মাসে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবার সার দেওয়ার পর প্রয়োজনে পানি দিতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

চারা রোপণের প্রথমদিকে প্রয়োজনমত সেচ দেয়া দরকার। খরা বা শুকনো মৌসুমে পানি সেচ দিলে ফল ঝরা কমে, ফলন বৃদ্ধি পায় এবং ফলের আকার ও অন্যান্য গুণাগুণ ভাল হয়।

ডাল ছাঁটাইকরণ

চারা অবস্থায় গাছকে সুন্দর কাঠামো দেয়ার জন্য অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছাঁটাই করে রাখতে হবে। ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে গাছের মরা, রোগাক্রান্ত ও পোকামাকড় আক্রান্ত ডালপালা কেটে পরিষ্কার করতে হবে।

ফল সংগ্রহ

শীতের শেষে গাছে ফুল আসে এবং বর্ষার শেষভাগে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল পাকে। ফল পূর্ণতা প্রাপ্তির সাথে সাথে হালকা লাল থেকে উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে। পরিপক্ক ফল হাত দিয়ে কিংবা জালিযুক্ত বাঁশের কোটা দিয়ে সংগ্রহ করতে হয়।

জৈব প্রযুক্তি (Biotechnology)

জৈব প্রযুক্তি বর্তমান সময়ে খাদ্য উৎপাদনে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটাতে চলেছে। জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কাঙ্ক্ষিত জিন বা একাধিক জিন প্রচলিত জাতে প্রবেশ করানো অথবা অনাকাঙ্ক্ষিত জিন নিষ্ক্রিয় করে ফলের উন্নতি সাধান সম্ভব। এভাবে জিন প্রকৌশল দ্বারা অধিক ফলনশীল, রোগমুক্ত, খরা ও লবণাক্ততা প্রতিরোধী উন্নতমানের নতুন জাতের ফসল উদ্ভাবন সম্ভব।

জৈব প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি বা গুণগত মান উন্নয়নের সাথে সাথে উন্নত মাতৃগুণ সম্পন্ন জাতের বংশ বিস্তারও ব্যাপক হারে করা সম্ভব। অসম প্রজাতির সংকরায়ণে সাধারণত ভ্রূণ নষ্ট হয়। এ ভ্রূণকে কৃত্রিম উপায়ে রক্ষা করে নতুন জাত উদ্ভাবন জৈব প্রযুক্তিতেই সম্ভব। তাই বাংলাদেশে জৈব প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম।

জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে চারা উৎপাদন

কলা

কলা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল। জমির পরিমাণ ও উৎপাদনের দিক থেকে কলার স্থান শীর্ষে। দেশে প্রায় ৫৪ হাজার হেক্টর জমিতে কলার আবাদ হয় যা থেকে বছরে প্রায় ৮ লক্ষ ৩৬ হাজার মেট্রিক টন কলা উৎপন্ন হয়। তেউড়ের (Sucker) মাধ্যমে প্রধানত কলা গাছের বংশ বিস্তার করা হয় এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে বছরে ১-২টি অসি তেউড় পাওয়া যায়। তাই বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য ভাল চারা প্রাপ্তি কঠিন হয়ে পড়ে। তাই অধিক পরিমাণে নিরোগ চারা উৎপাদনে টিস্যু কালচার পদ্ধতি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। প্রাথমিক পর্যায়ে চারা ছোট থাকে বিধায় স্থানান্তরে অল্প জায়গা নেয়, ফল বহন সহজ ও পরিবহণ খরচ কম পড়ে।

নিরোগ গাছ থেকে অসি তেউড় সংগ্রহ করে অগ্রাংশ ২ সেমি চওড়া ও ৫ সেমি লম্বা পরিমাণ আকারে কেটে গাছ ছত্রাকমুক্ত করার জন্য ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হয়। এ কাজটি রোগমুক্ত বিশেষ ঘরে করতে হবে। কর্তনকৃত অগ্রাংশটি আরো ছোট করে ১০৫ সেমি চওড়া ও ১.০ সেমি উচ্চতায় কেটে কৃত্রিম মিডিয়াতে রাখতে হবে। এমনি একটি অংশ থেকে বছরে অনেক চারা উৎপাদন সম্ভব। একটি কলার তেউড়ের অগ্রাংশ থেকে কৃত্রিম মিডিয়ায় অসংখ্য স্যুট হয়। এই স্যুটগুলোর মূল সৃষ্টির জন্য নতুন মিডিয়ায় স্থানান্তর করতে হয়। এভাবে তৈরি চারাগুলো মাটিতে লাগিয়ে কিছুদিন যত্ন নিয়ে মাঠে লাগাতে হয়।

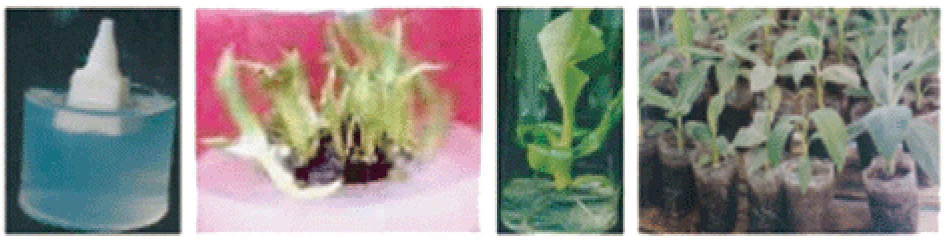

টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় কলার চারা উৎপাদন

কাঁঠাল

কাঁঠাল বাংলাদেশের জাতীয় ফল। বাংলাদেশের প্রায় সাড়ে ৯ হাজার হেক্টর জমিতে কাঁঠালের চাষ হয় এবং বাৎসরিক উৎপাদন প্রায় ৯৭৫ হাজার টন। সাধারণত বীজ দ্বারা বংশ বিস্তার হয়। পর পরাগায়িত ফল বলে বীজ হতে উৎপন্ন চারা মাতৃ গাছের গুণাগুণ রক্ষা করে না। অতি সম্প্রতি অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার আরম্ভ হয়েছে। মাতৃ গাছের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন চারা উৎপাদন একমাত্র টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমেই সম্ভব। এ পদ্ধতিতে উৎপন্ন চারা সতেজ ও স্বাস্থ্যবান হয়।

এ প্রযুক্তির মাধ্যমে কাঁঠালের উন্নত অমৌসুমী ও বারোমাসী গাছের দ্রুত বংশ বিস্তার ও সংরক্ষণ সহজ হবে। জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কাঁঠালের চারা উৎপাদনে সমর্থ হয়েছে।

আনারস

আনারস একটি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ফল। বাংলাদেশে প্রায় ১৬ হাজার হেক্টর জমিতে আনারস চাষ হয় এবং ২ লক্ষ ২৯ হাজার মেট্রিক টন আনারস উৎপাদিত হয়।

সিলেট, মৌলভীবাজার, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা আনারস চাষের জন্য প্রসিদ্ধ।

আনারস উৎপাদনের মৌসুম সাধারণত মধ্য-জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য-ভাদ্র (জুন থেকে আগস্ট) মাস পর্যন্ত। তবে কৃত্রিম হরমোন ব্যবহার করে সারা বৎসর আনারস উৎপাদন সম্ভব। আনারস অঙ্গজ উপায়ে প্রধানত বংশ বিস্তার করে থাকে। স্বাভাবিকভাবে বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে খুব সীমিত সংখ্যক চারা (Sucker) উৎপাদন হয়। ফলে আনারস চাষের সময় চারার মূল্য বৃদ্ধি পায় ও প্রয়োজনীয় চারার অভাবে চাষের জমির পমিাণ কমে যায়।

সম্প্রতি চারা উৎপাদনের জন্য টিস্যু কালচার পদ্ধতি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং টিস্যু কালচারের মাধ্যমে চারা উৎপাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে।

এ পদ্ধতিতে সারা বৎসর গবেষণাগারে কৃত্রিম পরিবেশে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ চারা উৎপাদন করা সম্ভব। মাতৃ গাছের অনুরূপ গুণাগুণের জন্য জাতের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয় না। টিস্যু কালচারের চারা সমবয়সি ও সমান আকৃতির হয় যার ফলে আনারস চাষ সহজ হয়।

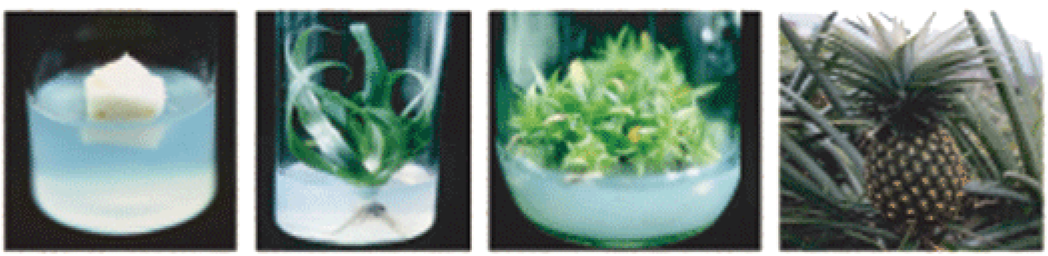

টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় আনারসের চারা উৎপাদন